Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমার আমলি অধঃপতনে আমার করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসনিম আক্তার চৌধুরী

রোলঃ ২২৮০২০৪৪১

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমার আমলি অধঃপতনে আমার করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসনিম আক্তার চৌধুরী
রোলঃ ২২৮০২০৪৪১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আমার আমলি অধঃপতনে আমার করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাসনিম আক্তার চৌধুরী, আইডিঃ ২২৮০২০৪৪১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আমার আমলি অধঃপতনে আমার করণীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tasnim

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

তাসনিম আক্তার চৌধুরী

আইডিঃ ২২৮০২০৪৪১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা 1

অধ্যায় ২: আমল - একটি পর্যালোচনা 2

অধ্যায় ৩: আমলি অধঃপতন 14

অধ্যায় ৪: আমলি অধঃপতনের কারণসমূহ 21

অধ্যায় ৫: আমলি অধঃপতনের প্রভাব 45

অধ্যায় ৬: আমলি অধঃপতন রোধে ব্যক্তিগত করণীয় 50

অধ্যায় ৭: পারিবারিক ও সামাজিক করণীয় 64

অধ্যায় ৮: কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা 73

অধ্যায় ৯: সফল উদ্যোগ ও বাস্তবিক প্রয়োগ 80

অধ্যায় ১০: উপসংহার: 96

রেফারেন্স 97

অধ্যায় ১: ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন কেবল তাঁর ইবাদতের জন্য। এই ইবাদতের মূল হলো আমল-আন্তরিকতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা প্রত্যেকটি সৎ কাজ। একজন মু'মিন তার আমলের মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং জান্নাতের যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সময়ের প্রবাহে, দুনিয়ার চাকচিক্য, শয়তান ও নফসের প্রবঞ্চনায় মানুষ ধীরে ধীরে আমল থেকে গাফেল হয়ে পড়ে। প্রথমে সালাতে অলসতা, পরে কুরআন তিলাওয়াতে অনীহা, এরপর একে একে অন্যান্য আমল থেকেও দূরে সরে যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় আমলি অধঃপতন।

১.১ বিষয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

এই অধঃপতন শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং তা পরিবারের মধ্যে দুর্বল ধর্মীয় পরিবেশ তৈরি করে, সমাজে পাপাচার বৃদ্ধি করে এবং পুরো উম্মাহর উপর প্রভাব ফেলে। আমি নিজেও এই বাস্তবতা অনুভব করেছি এবং উপলব্ধি করেছি-আমার আমলি অধঃপতন হচ্ছে। তাই নিজেকে সংশোধনের লক্ষ্যেই এ থিসিসের বিষয় নির্বাচন করেছি, যেন নিজের আমল সংশোধনের পাশাপাশি অন্যরাও উপকৃত হতে পারে।

১.২ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য

বর্তমানে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় উদাসীনতা, ইবাদতের প্রতি বিমুখতা এবং আমলের দুর্বলতা বড় একটি সংকটে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে তরুণ সমাজ সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত, ফ্রি মিক্সিং, অশ্লীলতা, গান-বাজনার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে আমলের গুরুত্ব ভুলে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমলের অধঃপতনের কারণগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে তার প্রতিকার নির্ধারণ করা আবশ্যক। এই গবেষণার মাধ্যমে:

- আমলের প্রকৃত গুরুত্ব তুলে ধরা,
- অধঃপতনের সুস্পষ্ট কারণ সমূহ ব্যাখ্যা করা,
- ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা,
- কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক করণীয় নির্ধারণ করা এবং

- একজন মুসলিমকে আত্মিকভাবে জাগ্রত করার পথ নির্দেশ করা-এসবই এই থিসিসের প্রধান উদ্দেশ্য।

১.৩ গবেষণার পরিধি ও পদ্ধতি

এই গবেষণাটি আত্মউপলব্ধি ও ধর্মীয় সচেতনতার আলোকে রচিত। মূলত ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও ধর্মীয় জ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কুরআনুল কারিম, সহিহ হাদিস, তাফসির, ইসলামি মনীষীদের কিতাব এবং প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ও বক্তব্য থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতিতে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ,ধর্মীয় দলিল উপস্থাপন এবং সমসাময়িক বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণার আওতায় তরুণ সমাজ, পরিবার, সমাজের সাধারণ মানুষের আমলি অবস্থা বিশ্লেষণ করে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

অধ্যায় ২: আমল - একটি পর্যালোচনা

২.১ আমলের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

আমল শব্দটি আরবি "عمل" থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ কাজ, কর্ম, আচরণ বা কার্যক্রম। ইসলামি পরিভাষায় "আমল" বলতে বোঝায়-সেসব কাজ ও আচরণ, যা একজন মুমিন ঈমানের ভিত্তিতে আল্লাহর আদেশ পালন ও সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করে থাকেন। এটি হতে পারে শারীরিক, মানসিক বা আত্মিক কোনো কাজ-যা কুরআন ও হাদীসের আলোকে শরিয়তসম্মতভাবে সম্পন্ন হয়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন - "আমল হলো এমন ইচ্ছাকৃত কাজ যা অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়।"

সুতরাং, আমল কেবল বাহ্যিক কোনো কাজ নয়; বরং তা নিয়ত, অন্তরের অবস্থা ও আল্লাহর জন্য আন্তরিকতার ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়িত হয়।

আমলের শ্রেণিবিন্যাস

আমলকে মূলত দুইভাগে ভাগ করা যায়:

১. দেহগত বা বাহ্যিক আমল: যা মানুষ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে সম্পাদন করে, যেমন: সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, সদকা ও ইনসাফ

২. অন্তরগত বা হৃদয়গত আমল: যা অন্তরের অনুভব ও ঈমানের নিদর্শনস্বরূপ প্রকাশ পায়, যেমন: তাকওয়া (আল্লাহভীতি), তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর নির্ভরতা), খুশু (নম্রতা ও বিনয়), ইখলাস (নিয়তের বিশুদ্ধতা), সবর (ধৈর্য), শোকর (কৃতজ্ঞতা)

আমলের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. নিয়তের বিশুদ্ধতা (إخلاص النية)
নিয়ত অর্থ হচ্ছে উদ্দেশ্য বা মনোভাব। ইসলামে প্রতিটি আমলের গ্রহণযোগ্যতা ও মূল্যায়ন এই নিয়তের উপর নির্ভর করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

" إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "

"নিশ্চয়ই সমস্ত কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল, আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে, যার সে নিয়ত করেছে।"
(সহীহ বুখারী: হাদীস ১, মুসলিম: ১৯০৭)
এ হাদীসটি ইখলাস বা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার গুরুত্ব প্রকাশ করে। কোনো আমল যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে করা হয়, তাহলে তা ইবাদত নয় বরং রিয়া (আত্মপ্রদর্শন), যা কবিরা গুনাহ।

২. শরিয়ত-সম্মত পদ্ধতি অনুসরণ
শুধু নিয়ত ভালো হলেই হবে না, আমলটি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক হতে হবে। ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "আমল তখনই গ্রহণযোগ্য হয় যখন তা সুন্নাত অনুযায়ী হয়।" (দারেমী: হাদীস ২০৫, সানাদ হাসান)
কুরআনে আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।" (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৩১)
কোনো ইবাদত বা আমল যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বিরোধী হয়, তা বাতিল ও গৃহীত হবে না। তাই, সঠিক জ্ঞান ও অনুসরণ অপরিহার্য।

৩. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া
আমলের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, না যে লোক দেখানো বা দুনিয়াবি স্বার্থে। কুরআনে আল্লাহ বলেন: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

“তাদেরকে কেবল এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে।” (সূরা আল-বাইয়্যিনাহ: আয়াত ৫)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ"
“আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ভয় পাই ছোট শিরক-যা হচ্ছে রিয়া (লোক দেখানো)।” (মুসনাদ আহমদ: হাদীস ২৩৬৩০, সনদ হাসান)
লোক দেখানো আমল মানুষকে আল্লাহর কাছে নয়, বরং শয়তানের পথে ধাবিত করে। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না হলে সেই আমল মূল্যহীন।

৪. আখিরাতের জন্য পাথেয়

আমল মানুষকে পরকালীন সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।
কুরআনে আল্লাহ বলেন: مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِ
“যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য তা বৃদ্ধি করে দিই।”
(সূরা আশ-শূরা: আয়াত ২০)
দুনিয়ার জীবন সাময়িক। তাই আমল এমন হওয়া উচিত যা আখিরাতে কাজে আসবে-যেমন সালাত, সিয়াম, দান-সদকা, সদ্ব্যবহার ইত্যাদি।

৫. দুনিয়াতে কল্যাণের কারণ

নেক আমলের প্রভাব শুধু আখিরাতে নয়, দুনিয়াতেও পাওয়া যায়।
কুরআনে আল্লাহ বলেন: مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً
“যে কেউ সৎকর্ম করে, পুরুষ বা নারী-আর সে মুমিন, তাকে আমি সুখময় জীবন দান করব।” (সূরা আন-নাহল: আয়াত ৯৭)
সৎ আমল মানুষের মন শান্ত রাখে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে, এবং দুনিয়ার সমস্যার মধ্যেও আল্লাহর বিশেষ সহায়তা এনে দেয়।

২.২ আমলের গুরুত্ব: কুরআন ও হাদীসের আলোকে

কুরআনের আলোকে আমলের গুরুত্ব

আমল বা সৎকর্ম ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা কেবল ঈমানের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং প্রতিটি মুসলিমের জীবনে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। কুরআনে সৎকর্মের গুরুত্ব বারবার উল্লেখিত হয়েছে, যাতে মুসলিমরা তাদের বিশ্বাসের সাথেসাথে সৎকর্মও পালন করতে পারে। কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে সৎকর্মের নৈতিক গুরুত্ব, এর ফলস্বরূপ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালে পুরস্কৃত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

১. **ঈমান ও আমল পরস্পর সম্পর্কিত:** আমল বা সৎকর্ম ঈমানের পরিপূরক। কেবল ঈমানের উপর দাঁড়িয়ে থাকলে তা পূর্ণতা লাভ করে না, বরং সৎকর্মের মাধ্যমে সে ঈমান বাস্তবে প্রতিফলিত হতে হয়। আল্লাহ বলেছেন: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا"

অর্থ: "যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান, যা তাদের পরিত্যক্ত আবাস হবে।"- সূরা আল-কাহফ (১৮:১০৭)

এটি স্পষ্টভাবে বলছে যে, ঈমান ও সৎকর্ম একে অপরের পরিপূরক। যারা ঈমানের সাথে সৎকর্ম করবে, তাদের জন্য জান্নাতের প্রত্যাশা রয়েছে। সুতরাং, ঈমানের পূর্ণতা পেতে হলে সৎকর্ম অপরিহার্য।

২. সৎকর্মের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর করা: সাধারণত মনে করা হয় যে, শুধুমাত্র ঈমান আনলেই মানুষ ভাল হয়ে যাবে, কিন্তু কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র ঈমান যথেষ্ট নয়, বরং সৎকর্মের মাধ্যমে জীবনে সত্যিকারের সৌন্দর্য অর্জিত হয়।

আল্লাহ বলেছেন:

"مَن عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ"

অর্থ: "যে ব্যক্তি (পুরুষ বা নারী) সৎকর্ম করবে এবং ঈমান আনবে, আমি তাকে একটি সুন্দর জীবন দান করব এবং তার প্রতিটি কাজের পুরস্কার তাকে দেব।" - সুরা আল-নাহল (১৬:৯৭)

এখানে আল্লাহ বলেন, সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সুন্দর জীবন দান করেন। এটি শুধু পরকালের পুরস্কার নয়, বরং এই পৃথিবীতেও আমাদের জীবনে ভালো ফল এনে দেয়। সৎকর্মের মাধ্যমে জীবনের মান উন্নত হয় এবং আল্লাহর কাছ থেকে সেরা পুরস্কার পাওয়া যায়।

৩. সৎকর্মের মাধ্যমে ক্ষমা লাভ: আল্লাহর কাছে ক্ষমা লাভের জন্য আমাদের সৎকর্ম প্রয়োজন। কুরআনে সৎকর্মের মাধ্যমে পাপের ক্ষমা পাওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন: "إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا"

অর্থ: "যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের খারাপ কাজগুলোকে ভালো কাজে পরিণত করবেন এবং তিনি সবসময় ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।" - সুরা আল-ফুরকান (২৫:৭০) এটি স্পষ্টভাবে জানাচ্ছে যে, সৎকর্মের মাধ্যমে আমাদের খারাপ কাজগুলো মাফ হতে পারে এবং আল্লাহ আমাদের সৎকর্মের কারণে ক্ষমা করবেন।

৪. সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন: একটি মুসলিমের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, এবং সেই সন্তুষ্টি শুধু সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহ বলেছেন: "قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"

অর্থ: "বল, আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহরই জন্য।" - সুরা আল-আন'আম (৬:১৬২)

এ আয়াতে আল্লাহ বলেন, মুসলিমদের জীবন এমনভাবে থাকতে হবে যে, তাদের সব কাজ আল্লাহর জন্য হওয়া উচিত। আমাদের জীবন, মৃত্যু, নামায, ইবাদত-সবকিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে।

৫. সৎকর্মের মাধ্যমে পরকালে পুরস্কৃত হওয়া: কুরআনে সৎকর্মের প্রতিফল পরকালে জান্নাতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যারা ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করবে, তাদের জন্য রয়েছে চিরকালীন পুরস্কার। আল্লাহ বলেছেন: " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيم" অর্থ: "যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের স্বাচ্ছন্দ্য, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" - সুরা আল-আহযাব (৩৩:৫৬)

এটি পরকালের পুরস্কারের কথা বলে। যারা ঈমান ও সৎকর্মে অতীত জীবন পরিচালনা করবে, তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত করেছেন।

হাদীসের আলোকে আমলের গুরুত্ব

১. আমল ঈমানের অঙ্গ

الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ ٱلْأَذَىٰ عَنِ ٱلطَّرِيقِ، وَٱلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ ٱلْإِيمَانِ

অর্থ: ঈমানের সত্তর বা তারও অধিক শাখা রয়েছে। সর্বোচ্চ শাখা হলো: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সবচেয়ে নিচু শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা। সহীহ মুসলিম, হাদীস নম্বর: ৩৫

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, ঈমান শুধু মুখের কথা নয়, বরং তা বাস্তব জীবনে কর্মে প্রকাশ পায়। একজন ঈমানদারকে তার আচরণ, লজ্জাশীলতা এবং উপকারী কাজে যুক্ত থাকা আবশ্যক। ছোট ছোট আমলও আল্লাহর নিকট মূল্যবান।

২.আমল ছাড়া ইচ্ছা যথেষ্ট নয়

ٱلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ ٱلْمَوْتِ، وَٱلْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّىٰ عَلَى ٱللَّهِ

অর্থ: বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করে। আর অক্ষম সেই ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং (কাজ না করেও) আল্লাহর উপর আশা করে। জামে তিরমিজি, হাদীস নম্বর: ২৪৫৯

এই হাদীসে বোঝানো হয়েছে যে, শুধু মনে আশা করলেই সফলতা আসবে না, বরং তার জন্য প্রস্তুতি ও আমল করতে হবে। প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই, যে নিজের জীবনকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করে।

৩. আমল ছাড়া গন্তব্য জান্নাত নয়

ٱعْمَلُوا فَكُلٌّ مُّيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

অর্থ: তোমরা আমল করো, কারণ প্রত্যেককে তার সৃষ্টি উদ্দেশ্য অনুযায়ী সহজ করা হয়েছে। সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর: ৬৬০৭

এই হাদীস আমলের নির্দেশ দেয়। মানুষের ভাগ্য ও তাকদীর আছে ঠিকই, কিন্তু তাকদীর অনুসরণ করতে হলে আমল করতে হবে। তাই হাদীসের নির্দেশ— "আমল করো"।

৪. আমল ছাড়া জান্নাতের আশা বৃথা

- لَنْ يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ

অর্থ: কারো আমলের মাধ্যমে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- অন্য রিওয়ায়াতে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ؟

তিনি বললেন: وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ

অর্থ: আমি-ও নয়, যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমতে আবৃত না করেন।

সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর: ৫৬৭৩

এই হাদীস জানিয়ে দেয়, আমল জান্নাতে যাওয়ার কারণ, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। আল্লাহর রহমত ছাড়া কেউই জান্নাতে যাবে না। তাই আমলের পাশাপাশি আল্লাহর করুণা লাভের জন্য দুআ করাও জরুরি।

২.৩ আমলের ধরণ ও প্রকারভেদ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এ ধর্মের মূল ভিত্তিগুলোর অন্যতম হলো "আমল" বা কর্ম। ইসলামী জীবনদর্শনে আমল শুধুমাত্র ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় সব ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। আমলের বিভিন্ন ধরণ ও শ্রেণি রয়েছে, যা ইসলামী শরিয়তের ভিত্তিতে পরিপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করে।

আমলকে সাধারণত দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়-**ইবাদতমূলক আমল** ও **সামাজিক আমল**। আবার ইবাদতমূলক আমলকেও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। নিচে সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. ফরয আমল (فرض عمل): ফরয সেই আমল, যা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য বা অবশ্য পালনীয় করা হয়েছে। এগুলো আদায় না করলে কঠিন গুনাহ হয় এবং আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ:

- দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত
- রমযানের রোযা
- হিসাব অনুযায়ী যাকাত প্রদান
- সামর্থ্যবানদের জন্য হজ পালন

আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন: إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا

অর্থ: "নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের জন্য নির্ধারিত সময়ে ফরয করা হয়েছে। - *সূরা আন-নিসা: ১০৩*

২. ওয়াজিব আমল (واجب عمل): ওয়াজিব হলো এমন আমল যা ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ফরযের স্তরে উন্নীত হয়নি। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব আমল পরিত্যাগ করলে শাস্তিযোগ্য হয়ে ওঠে। যেমন:

- ঈদের নামাজ
- কুরবানির পশু জবাই
- বিতর নামাজ

৩. সুন্নাত আমল (سنة عمل): সুন্নাত এমন আমল যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিতভাবে করেছেন এবং তাঁর উম্মতদেরও উৎসাহিত করেছেন। এটি দুই প্রকার:

- **সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ:** রাসূল (সা.) নিয়মিত করতেন এবং ছেড়ে দেওয়াকে অপছন্দ করতেন, যেমন ফজরের আগে দুই রাকাত সালাত।

- **সুন্নাতে গাইর মু'আক্কাদাহ:** অনিয়মিতভাবে করতেন, যেমন আসরের আগে চার রাকাত নফল সালাত।

৪. নফল আমল (نفل عمل): নফল আমল অর্থ ঐচ্ছিক বা অতিরিক্ত ইবাদত। এগুলো করলে সওয়াব হয়, না করলে গোনাহ হয় না। তবে নফল আমল ব্যক্তিকে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী করে তোলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন (হাদীসে কুদসী):
"আমার বান্দা যতক্ষণ না আমার নিকটবর্তী হয় নফল ইবাদতের মাধ্যমে, আমি তাকে ভালোবাসি।"
- সহীহ বুখারী: ৬৫০২

নফল আমলের উদাহরণ:

- তাহাজ্জুদ
- দুহা সালাত
- সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা
- বেশি বেশি তাওবা ও ইস্তিগফার

৫. হারাম ও মাকরুহ আমল: আমল শুধু ইতিবাচক দিকেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামে কিছু আমল আছে যা নিষিদ্ধ এবং কিছু আছে যা অপছন্দনীয়।

- **হারাম:** যেমন মদ পান, সুদ গ্রহণ, চুরি, জিনা ইত্যাদি। এগুলো কবিরা গুনাহ ও শাস্তিযোগ্য।
- **মাকরুহ:** অপছন্দনীয় কাজ, যেমন দাঁড়িয়ে পানি পান করা, জোরে হাঁচি দেওয়া ইত্যাদি।

৬. আমলের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রকারভেদ

আমলকে আবার এর সম্পাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে ভাগ করা যায় তিনভাবে:

- **শারীরিক আমল:** যেমন সালাত, রোযা, জিহাদ
- **আর্থিক আমল:** যেমন যাকাত, সদকা, কুরবানি
- **মিশ্র আমল:** যেমন হজ, যা আর্থিক ও শারীরিক উভয় দিক থেকেই করতে হয়

এইভাবে আমরা দেখতে পাই, ইসলামে আমল কোনো একক ও সরল ধারণা নয়, বরং এটি একটি বহুস্তর বিশিষ্ট ও সামগ্রিক জীবনপদ্ধতির অংশ। ইসলামী জীবন গঠনে এসব আমলের শ্রেণিবিন্যাস বোঝা যেমন জরুরি, তেমনি তা যথাযথভাবে পালন করাও অত্যন্ত আবশ্যক।

২.৪ ঈমান ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক

ঈমান ও আমল ইসলামের দুটি অপরিহার্য মৌলিক স্তম্ভ, এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ইসলামের ভিত্তি গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনে ঈমান ও আমলের সম্পর্ক বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, এবং এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশিত যে, ঈমান ছাড়া আমল সম্ভব নয় এবং আমল ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে, ঈমানের সাথে সৎকর্মের সম্পর্ক রয়েছে, এবং সৎকর্ম ঈমানের বাস্তব রূপ হিসেবে গৃহীত হয়।

ঈমান ও আমল একে অপরের পরিপূরক

ঈমান ও আমল একে অপরের পরিপূরক। সৎকর্ম (আমল) ঈমানের বাস্তব রূপ, এবং এই দুইটি একসাথে মুমিনের পরিপূর্ণতার জন্য অপরিহার্য। শুধু ঈমান থাকলেই হবে না, বরং সে ঈমানের ভিত্তিতে সৎকর্ম করতে হবে। কুরআনে বারবার বলা হয়েছে যে, যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের পুরস্কার রয়েছে। ঈমানের সঠিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সৎকর্মের মাধ্যমে সেটি প্রমাণিত হয়।
আল্লাহ বলেন, " ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُون"
“নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।” (সূরা বাকারা, আয়াত ৮২)

আমল ঈমানের প্রমাণ

যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের পুরস্কার আল্লাহ কখনো নষ্ট করবেন না। আমল ঈমানের বাস্তব প্রমাণ। যখন ঈমানী বিশ্বাস সৎকর্মে রূপান্তরিত হয়, তখন তা আল্লাহর কাছে প্রশংসিত এবং পুরস্কৃত হয়। ঈমান শুধুমাত্র মন ও অন্তরে বিশ্বাস করার বিষয় নয়, বরং তা একটি কাজের মাধ্যমে দৃশ্যমান হতে হয়। সৎকর্ম ঈমানের পরিপূর্ণ রূপ।
কুরআনের আয়াত: "وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا"
নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আমি তাদের সৎকর্মের প্রতিদান কখনোই বিনষ্ট করি না। - সূরা আল-কাহফ (১৮:৩০)

ঈমান ছাড়া আমল গ্রহণযোগ্য নয়

কুরআনে আল্লাহ বলেন : "وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ" তাদেরকে শুধু এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন একনিষ্ঠভাবে খাঁটি মনে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে, নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। এটাই সরল ও সঠিক ধর্ম।- সুরা আল-বায়্যিনাহ (৯৮:৫)।

এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, মানুষের সকল আমল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য করা হবে। এটি বোঝায় যে, আমল যদি ঈমানের সাথে না থাকে বা আল্লাহর জন্য না করা হয়, তবে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ, ঈমান ছাড়া কোনো আমল পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, এবং আমল কখনই পূর্ণাঙ্গ হবে না যদি তা ঈমানের সাথে না থাকে।

ঈমানের শক্তি ও আমলের সাফল্য

যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। এখানে ঈমান ও আমলের একত্রিত প্রভাব আল্লাহর পুরস্কারের পাথেয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঈমান যখন সৎকর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, তখন তা আল্লাহর প্রশংসিত এবং পুরস্কৃত হয়। ঈমান ও আমল একত্রিতভাবে মুমিনের সাফল্য নিশ্চিত করে।

আল্লাহ বলেন, "إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلنَّعِيمِ" নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত। - সুরা লুকমান (৩১:৮)

- **আমল ছাড়া ঈমান অসম্পূর্ণ**

আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ঈমানের পর সৎকর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। ঈমান ও আমল একটি সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থার অংশ, যেখানে সৎকর্মের মাধ্যমে ঈমানের পরিপূর্ণতা আসে। সুতরাং, যারা শুধু ঈমান রাখে কিন্তু সৎকর্মে মনোযোগী হয় না, তাদের ঈমান অসম্পূর্ণ থাকে।

আল্লাহ বলেন, "وَقُلْ لِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكَاةَ" "আর আমার বান্দাদের বলো, যারা ঈমান এনেছে, তারা যেন সালাত কায়েম করে এবং আমি যেসব রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে।" - সূরা ইব্রাহিম (১৪:৩১)

ঈমান ও আমল ইসলামের দুইটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঈমানের সঠিক রূপ তখনই প্রকাশিত হয় যখন তা সৎকর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, এবং আমল ঈমানের পূর্ণতা পায় যখন তা আল্লাহর

সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। ঈমান ও আমল একে অপরের পরিপূরক এবং তারা মুমিনের পরিপূর্ণ সফলতা এবং পরকালের পুরস্কারের দিকে পথপ্রদর্শন করে। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন আয়াতে এই সম্পর্ক স্পষ্টভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। ঈমান এবং আমল একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত, এবং একটি ছাড়া অন্যটি পূর্ণতা পায় না।

অধ্যায় ৩: আমলি অধঃপতন

আমলি অধঃপতন হল এমন একটি অবস্থার প্রতিফলন, যেখানে একজন মুসলিম তার দ্বীনি ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে গিয়ে গুনাহ ও ভুল কাজে লিপ্ত হয়। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যা ধীরে ধীরে একজন ব্যক্তির অন্তর ও বাহ্যিক আচরণকে দূর্বল করে ফেলে, ফলে তার ধর্মীয় জীবনে অবনতি ঘটে। আমলি অধঃপতন এক ধরনের আত্মিক অসুস্থতা যা ব্যক্তির দ্বীনি ও সামাজিক অবস্থানকে প্রভাবিত করে।

৩.১ আমলি অধঃপতনের সংজ্ঞা

আমলি অধঃপতন বলতে বোঝায় একজন মুসলমানের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ইসলামী অনুশাসন থেকে বিচ্যুতি, নেক আমলের প্রতি উদাসীনতা, গুনাহের প্রতি আসক্তি এবং দ্বীনী দায়িত্ব পালনে অবহেলা। এই অধঃপতন প্রথমে অন্তরে উদ্ভূত হয়, পরে তা বাহ্যিক আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। এটি এমন একটি অবস্থা, যেখানে ব্যক্তি মুসলমান নামধারী হলেও তার জীবনে ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো যেমন-সালাত, রোজা, পর্দা, দান-সদকা, ইলম অর্জন, সুন্নতের অনুসরণ ইত্যাদির বাস্তব প্রয়োগ অনুপস্থিত থাকে।

এই অবস্থা ধীরে ধীরে ঈমানের দুর্বলতার কারণ হয় এবং একসময় মানুষকে পথভ্রষ্টতার গভীরে নিমজ্জিত করে। একজন ব্যক্তি তার আমলে দুর্বল হলে তার আত্মিক উন্নতি থমকে যায়, আল্লাহর রহমত থেকে দূরে চলে যায় এবং তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় নষ্ট হয়ে যায়।

কুরআনের আলোকে

- "অতঃপর তাদের পরে এমন উত্তরসূরী এল, যারা সালাত নষ্ট করল ও খেয়াল-খুশির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা গোমরাহী ও ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।" - (সূরা মারইয়াম: ৫৯)। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, নামাযের প্রতি অবহেলা ও নফসের কামনার অনুসরণ আমলি অধঃপতনের প্রাথমিক লক্ষণ। আমলের অবহেলা ঈমানকেও দুর্বল করে দেয় এবং মানুষকে গোমরাহির দিকে ঠেলে দেয়।
- "আল্লাহ তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন তাদের কুফরের কারণে; ফলে তারা খুব অল্পই ঈমান আনে।"- (সূরা নিসা: ১৫৫) এখানে বোঝা যায়, আল্লাহর হুকুম অমান্য করা এবং আমলে অবহেলার ফলে হৃদয়ে মোহর লেগে যায়।

হাদীসের আলোকে

- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "মানুষ ও কুফরের মধ্যবর্তী পার্থক্য হলো সালাত।"- (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৮২)। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করে, তার ঈমান বিলুপ্ত হতে পারে। আমলের এই পতনই ধীরে ধীরে মানুষকে কুফরের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়।
- এক হাদীসে তিনি বলেন:

"সাবধান! দেহে একটি মাংসপিণ্ড আছে, যদি তা ভালো হয়, তবে সম্পূর্ণ দেহ ভালো হয়; আর যদি তা নষ্ট হয়, তবে সম্পূর্ণ দেহই নষ্ট হয়। শুন! সেটি হলো হৃদয়।"(সহীহ বুখারী: ৫২) এখানে বোঝা যায়, **আমলের পতন শুরু হয় হৃদয়ের ভেতরে থেকে;** যখন অন্তরে তাকওয়া ও খোদাভীতি কমে যায়, তখন বাহ্যিকভাবে আমলে দুর্বলতা আসে।

ওলামায়ে কিরামের বিশ্লেষণ

ইমাম গাযযালী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন"-এ বলেন:

"ইলম ও আমল একে অপরের সহায়ক। ইলম ছাড়া আমল অন্ধ, আর আমল ছাড়া ইলম অর্থহীন। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে কিন্তু আমল করে না, সে আল্লাহর দরবারে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।"

- ইহইয়া উলুমিদ্দীন, খণ্ড ১, পৃ: ১৫৭

ইবনে কায়্যিম (রহ.) বলেন:

"গুনাহ এমন একটি আগুন, যা ঈমানকে ধীরে ধীরে ভস্ম করে দেয়। প্রথমে তা নেক আমল কমিয়ে দেয়, পরে ঈমান দুর্বল করে এবং একসময় হিদায়াত থেকে বিচ্যুতি ঘটায়।"

- আদ-দাওয়াউদ-দাওয়া, পৃ: ৬৪

সমসাময়িক বাস্তবতা

বর্তমান মুসলিম সমাজে আমলি অধঃপতনের লক্ষণ অত্যন্ত প্রকট। নামাযে অলসতা, কুরআন থেকে বিমুখতা, পর্দাহীনতা, গান-বাজনায় আসক্তি, হারাম উপার্জনে জড়ানো, সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত সময় ব্যয়, অশ্লীলতা দেখা ও শুনা, ধর্মীয় বিধান নিয়ে ঠাট্টা করা ইত্যাদি হচ্ছে এই অধঃপতনের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। এসব কারণে সমাজে অস্থিরতা, মানসিক অশান্তি ও আত্মিক শূন্যতা দিন দিন বাড়ছে।

পরিণতি

আমলি অধঃপতন কেবল দুনিয়ার ক্ষতি করে না; বরং আখিরাতে চরম ক্ষতির কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "কেয়ামতের দিন প্রথম যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তা হলো নামায।" - (তিরমিযী, হাদীস: ৪১৩)। **যদি আমলে অধঃপতন হয়, সেই ব্যক্তি আল্লাহর আদালতে ব্যর্থ হবে** এবং আখিরাতে তার জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করবে।

৩.২ অধঃপতনের সূচনা লক্ষণ ও বহিঃপ্রকাশ

মানবজীবনে আত্মিক ও আমলগত স্থিতিশীলতা রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে অনেক সময় বিভিন্ন প্রভাব, পরিবেশ ও নফসের প্ররোচনায় একজন মুমিন ধীরে ধীরে আল্লাহর নির্দেশিত পথ থেকে সরে পড়ে। এ অবস্থাকেই 'আমলি অধঃপতন' বলা হয়। এটি সাধারণত হঠাৎ ঘটে না; বরং ধীরে ধীরে কিছু লক্ষণ ও বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সূচনালক্ষণগুলো চিনে রাখলে সময়মতো সংশোধনের সুযোগ থাকে। নিচে এই লক্ষণগুলোর বিশদ বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

১. সালাতে গাফিলতি ও অলসতা

নামাজ হলো ইসলামের মূল স্তম্ভ, যা মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী প্রধান আমল। হাদিসে এসেছে: "নামাজ ত্যাগ করা কুফরের সাথে সম্পৃক্ত। ((তিরমিজি, হাদিস: ২৬২১) একজন ব্যক্তি যখন সালাত আদায়ে অলসতা প্রদর্শন করে, কখনো পড়ে কখনো ছেড়ে দেয়, অথবা কেবল দেহ দিয়ে আদায় করে অথচ অন্তর উদাসীন থাকে-তখনই তার আমলি

অধঃপতনের সূচনা হয়। এই গাফিলতা ধীরে ধীরে নামাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে।

২. গুনাহকে তুচ্ছ ও স্বাভাবিক মনে করা

গুনাহ বা পাপ কখনোই ছোট নয়। সাহাবিদের মতে, আমরা যেসব গুনাহকে তুচ্ছ মনে করি, রাসূলুল্লাহ (সা.) সেগুলোকে ধ্বংসকারী মনে করতেন। যখন কেউ হারাম কাজকে ‘সামান্য ভুল’ হিসেবে দেখে, তখন সে নিজের অন্তরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। পাপের প্রতি ভয় ও লজ্জা হারিয়ে ফেলাই আত্মিক পতনের এক বড় লক্ষণ।

৩. যিকির, কুরআন তিলাওয়াত ও নফল ইবাদতে বিমুখতা

যখন কেউ কুরআনের আলো থেকে দূরে সরে যায়, যিকির ও দোয়া তার জীবনে স্থান পায় না এবং নফল ইবাদতে অনাগ্রহ জন্মায়, তখন অন্তর কঠিন হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:"যে ব্যক্তি আমার জিকির থেকে মুখ ফিরায়, তার জীবন সংকীর্ণ করে দিব এবং কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাব।" (সূরা ত্বা-হা: ১২৪)

এই বিমুখতাই মনের শূন্যতা সৃষ্টি করে, যার ফলে মানুষ গুনাহে মজে যেতে থাকে।

৪. দ্বীনি আলোচনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলা

ইসলামী জ্ঞান, হালাল-হারাম, আখিরাত, তাকওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা শুনতে কারও যদি আর ভালো না লাগে-বরং বিরক্তি লাগে-তবে তা তার অন্তরের গাফিলতির প্রতীক। এই অবস্থা একজন ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে ইসলামি চেতনা থেকে সরিয়ে দেয় এবং দুনিয়ামুখী করে তোলে।

৫. খারাপ সঙ্গ ও অপসংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ

"তুমি কাকে বন্ধু বানালে, তুমি তাই হয়ে যাবে।"-এই বাণী যেমন সত্য, তেমনি বাস্তব। হাদীসে এসেছে: "মানুষ তার বন্ধুদের ধর্ম অনুযায়ী চলে, কাজেই তোমরা কাকে বন্ধু বানাচ্ছো, দেখো।"

(আবু দাউদ, হাদীস: ৪৮৩৩)

দুষিত সঙ্গ ও নোংরা সংস্কৃতির প্রভাব একজন ব্যক্তিকে সত্য থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে মিথ্যার আবরণে মোড়ানো এক ভিন্ন বাস্তবতায় নিয়ে যায়।

৬. সোশ্যাল মিডিয়ায় অশ্লীলতা ও সময়ের অপচয়

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া একজন ব্যক্তির ঈমান ও আমলের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ। ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মে অশ্লীল ও বিভ্রান্তিকর কনটেন্টের সহজলভ্যতা মুসলিম তরুণদের আত্মিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হারাম দেখা, অযথা সময় নষ্ট করা এবং **অহেতুক আত্মপ্রদর্শনের ইচ্ছা**-এসবই নফসকে শক্তিশালী করে এবং আমলকে দুর্বল করে।

৭. দ্বীনি দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহ

জামাতের নামাজ ত্যাগ, ইসলামি সংগঠন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া, দাওয়াতি ও সামাজিক দ্বীনি কাজে অনীহা প্রদর্শন-এসবই আমলি দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। এভাবেই একজন মুসলিম ধীরে ধীরে সমাজের এক ভারহীন সদস্যে পরিণত হয়, যার ঈমান কেবল নিজের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা অন্যদের মাঝেও হারিয়ে যায়।

৮. অহংকার, আত্মপ্রশংসা ও হিংসা

রিয়া (লোক দেখানো আমল), নিজের আমল নিয়ে গর্ব করা, অন্যকে হেয় করা এবং নিজের প্রশংসায় মগ্ন থাকা-এসবই শয়তানের পথে পরিচালিত করে।
হাদীসে এসেছে: "তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী: কৃপণতা যার অনুসরণ করা হয়, খেয়াল-খুশির অনুসরণ এবং নিজের প্রতি আত্মতুষ্টি।" (বায়হাকি, শুআবুল ঈমান)

আমলি অধঃপতনের সূচনালক্ষণগুলো এমন নয় যেগুলো সহজেই নজরে আসে; বরং এগুলো সূক্ষ্মভাবে ধীরে ধীরে আত্মা ও আমলকে গ্রাস করে। তাই একজন সচেতন মুসলিমের উচিত-নিজেকে প্রতিনিয়ত যাচাই করা, তওবার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। মনে রাখতে হবে, যারা নিজেদের সংশোধন করে, আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন। "নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সব মানুষের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যারা নিজেরা নিজেদের পরিবর্তন করে না।"(সূরা রা'দ: ১১)

৩.৩ আত্মিক ও বাহ্যিক অধঃপতনের পার্থক্য

আমলি অধঃপতন মূলত দুইটি স্তরে-আত্মিক এবং বাহ্যিক-প্রকাশ পায়। এ দুটি স্তরের অধঃপতন একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আত্মিক অধঃপতন মানুষের অন্তরের অবস্থা এবং বিশ্বাসের পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে, যেখানে বাহ্যিক

অধঃপতন তার আচরণ ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এই অধ্যায়টি তাদের মধ্যে পার্থক্য এবং একে অপরের ওপর প্রভাব সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করবে।

১. আত্মিক অধঃপতন

আত্মিক অধঃপতন হলো মানুষের অন্তরের দুর্বলতা এবং ঈমানের পতন। এটি সাধারণত ধীরে ধীরে ঘটে এবং তা একটি গোপন প্রক্রিয়া হিসেবে উপস্থিত হয়, যা বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না। অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অভাব, এবং দ্বীনি জ্ঞান ও আস্থা হ্রাস পেলে এটি আত্মিক অধঃপতনের সূচনা হয়। এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে ব্যক্তি নিজের আত্মা এবং বিশ্বাসের প্রতি গাফেল থাকে।

ঈমানের দুর্বলতা

যখন একজন মানুষের ঈমান দুর্বল হয়, তখন তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা কমে যায় এবং তার দৈনন্দিন জীবনেও তার প্রভাব পড়ে।

আল্লাহ বলেন, "وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَفَنَاهُمْ فِي لُهُوِهِمْ وَمُحَرَّمَاتِه ِ" অর্থ: "তোমরা তাদের মতো হবে না যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেও ভুলিয়ে দিয়েছেন।" (আল-হাশর ৫৯:১৯)। যখন ঈমান দুর্বল হয়, তখন মানুষ আল্লাহর প্রতি অবহেলা শুরু করে এবং তার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পাল্টে যায়। এতে পরিণামে তার অন্তরে আল্লাহর স্মরণ হারিয়ে যায়, যা আত্মিক অধঃপতনের সূচনা।

- **গুনাহের প্রতি আসক্তি**

গুনাহ বা পাপের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ মানুষের অন্তরে নৈতিক দুর্বলতা সৃষ্টি করে। যখন গুনাহকে ছোট মনে করা হয়, তখন মানুষ তার পরিণতি সম্পর্কে অবহেলা করতে থাকে।

আল্লাহ বলেন "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ"

অর্থ: "আল্লাহ শিরক ছাড়া অন্য সব পাপ ক্ষমা করতে পারেন, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" (আন-নিসা ৪:৪৮)। এই আয়াতটি নির্দেশ করে যে গুনাহকে তুচ্ছ করে মেনে নেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। আল্লাহ তার বান্দাদের পাপ মাফ করতে পারেন, তবে শিরক বা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করা আল্লাহ মাফ করবেন না।

২. বাহ্যিক অধঃপতন

বাহ্যিক অধঃপতন হচ্ছে সেই আচরণ এবং কার্যকলাপ, যা ব্যক্তির জীবনযাত্রা, সমাজ ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। বাহ্যিক অধঃপতন সাধারণত দৃশ্যমান এবং এটি মানুষের শারীরিক আমল, সামাজিক সম্পর্ক, এবং সমাজে তার অবস্থানকে প্রভাবিত করে।

বাহ্যিক অধঃপতন এর মানে হলো, যখন ব্যক্তির আনুগত্য, দ্বীনি শিক্ষা, এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং তার আচরণে গুনাহের প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা দেয়।

নামাজে অবহেলা

ইসলামিক জীবনযাত্রার মূল স্তম্ভ হলো নামাজ। যখন কেউ নামাজে অবহেলা করে, তার অন্তরের অবস্থাও দুর্বল হয়। আল্লাহ বলেন"وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُون" (আল-মা'উন ১০৭:৪-৫) অর্থ: "দুর্দশা তাদের জন্য যারা নামাজে অবহেলা করে।" নামাজ হলো মুসলিম জীবনের ভিত্তি। যদি কেউ নামাজে অবহেলা করে, তাহলে তার জীবন থেকে আল্লাহর আশীর্বাদ সরে যেতে পারে, যার প্রভাব তার দৈনন্দিন জীবনেও পড়বে।

- **হারাম কাজের প্রতি আকর্ষণ**

ইসলামে যেসব কাজ হারাম বা নিষিদ্ধ, সেগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বাহ্যিক অধঃপতনের লক্ষণ। আল্লাহ কোরআনে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেন।

"إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون" অর্থ: "সে তোমাদেরকে খারাপ কাজ, অশ্লীলতা এবং আল্লাহ সম্পর্কে জানেনা এমন কথা বলার আদেশ দেয়।" (আল-বাকারা, ১৬৯) এই আয়াতটি আমাদের সতর্ক করে যে, যখন মানুষ হারাম কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অশ্লীলতা বা মিথ্যা কথা বলতে থাকে, তখন সে তার জীবন থেকে ইসলামের আদর্শ ভুলে যায়।

৩. আন্তরিকতা ও বাহ্যিক কর্মের সম্পর্ক

অন্তরের শক্তি বাহ্যিক আচরণে প্রতিফলিত হয়। "وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُون" (আল-নাহল ১৬ :১২৮) অর্থ: "আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মে রত।" যখন একজন মুসলিম অন্তরে তাকওয়া ও সৎকর্মের মনোভাব রাখে, তার বাহ্যিক কাজও সঠিক হবে। একটি ভালো অন্তর ভালো বাহ্যিক কাজ সৃষ্টি করে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব।

আত্মিক অধঃপতন কখনোই বাহ্যিক অধঃপতনের থেকে আলাদা নয়। একটির প্রভাব অপরটির ওপর পড়ে। একজনের অন্তর দুর্বল হলে, তার বাহ্যিক কর্মও তার অন্তরের অবস্থা অনুযায়ী পাল্টে যায়। এভাবে, বাহ্যিক দুর্বলতা অন্তরের অবস্থা আরও খারাপ করতে পারে এবং সে আরো অধঃপতিত হতে পারে।

অধ্যায় ৪: আমলি অধঃপতনের কারণসমূহ

আমলি অধঃপতনের নানা কারণ রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম নৈতিক দুর্বলতা, পারিপার্শ্বিক চাপ, এবং আত্মিক দুর্বলতা। এই অধ্যায়ে আমরা এসব কারণের গভীরে গিয়ে আলোচনা করবো, যেমন- কীভাবে অজ্ঞতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব বা পরিবেশগত প্রভাব একজন মুসলিমের আচরণকে প্রভাবিত করে এবং কিভাবে এই অধঃপতন তার দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হয়।

৪.১: নৈতিক দুর্বলতা

নৈতিক দুর্বলতা হচ্ছে এমন একটি অবস্থা, যেখানে একজন ব্যক্তি ইসলামী আদর্শ, মূল্যবোধ ও নৈতিক শিষ্টাচার থেকে সরে গিয়ে ভুল ও অমানবিক কাজ করতে থাকে। এটি তার চরিত্র এবং আচার-আচরণে প্রতিফলিত হয়, যেমন: সততা হারানো, অন্যদের প্রতি অবিচার করা, এবং আল্লাহর বিধান ও নির্দেশনা উপেক্ষা করা।
ইসলাম মানব জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ দিশা প্রদান করেছে, যেখানে নৈতিকতা, সততা, এবং আধ্যাত্মিক শক্তি বিশেষ গুরুত্ব পায়। তবে, যখন ব্যক্তি তার নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলে, তখন তার ধর্মীয় অনুশাসন এবং জীবনের প্রতিটি দিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইসলামের নির্দেশনা অনুসরণ করতে না পারলে ব্যক্তি তার চরিত্রের বিশুদ্ধতা হারাতে পারে এবং এটি ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াও সমাজের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। ইসলামে নৈতিক দুর্বলতা মানে হচ্ছে আল্লাহর বিধান ও ইসলামী শিষ্টাচারের প্রতি অবহেলা, যা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে।

নৈতিক দুর্বলতার কারণসমূহ

নৈতিক দুর্বলতা একটি গভীর বিষয়, যা মানবিক চরিত্রের মূল ভিত্তি নষ্ট করে এবং ব্যক্তি ও সমাজে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। এটির বিস্তৃত কারণসমূহে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে যা একটি ব্যক্তির নৈতিক অবস্থা খারাপ করার জন্য দায়ী হতে পারে। নিচে আমি বিস্তারিতভাবে এই কারণগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করছি:

১. ঈমানের দুর্বলতা

ইমানের দুর্বলতা এমন একটি অবস্থা, যেখানে একজন মুসলিম আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস বা ঈমান হারিয়ে ফেলে, অথবা তার বিশ্বাস ও আনুগত্যে কোনো ধরনের কমতি আসে। যখন একজন ব্যক্তির ঈমান দুর্বল হয়, তখন সে ইসলামের বিধি-নিষেধ এবং নৈতিক দিক থেকে

সরে যেতে শুরু করে। এটা তার চরিত্রে দুর্বলতা সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে সে ভুল পথে চলতে থাকে। আল্লাহ বলেছেন:

আল্লাহ তায়ালা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا "তারা বলবে, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের চোখের প্রশান্তি দাও, আমাদের ঈমান বৃদ্ধি দাও।' আল-আহযাব (২৮: ৬৫) যখন একে অপরকে আল্লাহর পথে দৃঢ় রাখতে বলা হয়, তখন ঈমানের শক্তি ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি করতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২. পারিপার্শ্বিক চাপ

পারিপার্শ্বিক চাপ এমন একটি অবস্থা যেখানে একটি ব্যক্তি তার চারপাশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অথবা পারিবারিক পরিবেশের কারণে নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। মন্দ পরিবেশ, খারাপ বন্ধু, এবং সমাজের নেতিবাচক প্রভাব একে অপরকে অপরাধী কাজের দিকে প্রলুব্ধ করতে পারে। অনেক সময় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, যেখানে একজন ব্যক্তি তার সঠিক নৈতিক পথ অনুসরণ করার পরিবর্তে পারিপার্শ্বিক চাপের কারণে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়। হাদীস উল্লেখ এসেছে, "من آمن بالله ولم يلبس إيمانه بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون" যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তার ঈমানকে জুলুম (শিরক বা অন্যায়) দ্বারা কলুষিত করে না, তারাই নিরাপত্তা পাবে এবং সৎপথপ্রাপ্ত হবে। (সহিহ মুসলিম, হাদীস ২৬৫)

৩. নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ

মানুষের মন সবসময় তার প্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে থাকে এবং অনেক সময় সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। যদি একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র তার নিজস্ব খেয়াল এবং চাহিদা পূরণের দিকে মনোনিবেশ করে, তবে সে ইসলামের বিধি-বিধান এড়িয়ে চলে এবং তার নৈতিক জীবন দুর্বল হয়ে পড়ে। ইসলামে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ, এবং এমনটি না করলে একজন ব্যক্তি নৈতিক অধঃপতনে পড়তে পারে।

কোরআনে আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

অর্থ : তারপর আমি অবশ্যই তাদের সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে তাদের কাছে আসব, এবং তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না। (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৭)

৪. অত্যাধিক ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ

যেসব ব্যক্তি শুধুমাত্র অর্থ এবং বাহ্যিক সুবিধা অর্জনের জন্য জীবনযাপন করে, তারা সাধারণত নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে। তারা ভুল পথে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে এবং ইসলামের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। অত্যাধিক ধন-সম্পদ বা বিশ্বসুখের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ তাদের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক অবস্থাকে দুর্বল করে দেয়।

সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

মানুষের কাছে শোভন করে উপস্থাপন করা হয়েছে কামনার বস্তুসমূহ - নারী, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রূপার সঞ্চয়, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদিপশু এবং শস্যক্ষেত্র। এগুলো পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল। আলে ইমরান (৩: ১৪)

৫. মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা

মানসিক চাপ এবং দুশ্চিন্তা নৈতিক দুর্বলতার অন্যতম কারণ। যখন একজন ব্যক্তি মানসিকভাবে দুর্বল এবং উদ্বিগ্ন থাকে, তখন সে সহজেই অনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে পারে। বিশেষ করে, আর্থিক অনটন বা পারিবারিক সমস্যা ব্যক্তিকে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, যার ফলে সে নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى...

বাংলা: হে ঈমানদারগণ! তোমরা দান-সদকা বাতিল করে দিও না উপকারের কথা বলে অথবা কষ্ট দিয়ে-যেমন সে ব্যক্তি, যে মানুষকে দেখানোর জন্য তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে, অথচ সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। আল-বাকারা (২: ২৬৪):

৭. শয়তানের প্ররোচনা

শয়তান সবসময় মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করে। সে তার চক্রান্তে ব্যস্ত থাকে, যাতে মানুষ ইসলামের পথ থেকে সরে যায় এবং পাপের দিকে চলে যায়। শয়তান যখন মানুষের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে, তখন তারা নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ এসেছে,

- إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

বাংলা অনুবাদ: নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, অতএব তোমরা তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করো। সূরা আল-আ'রাফ (৭:২০০)

- إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنسَانِ مَجْرَى الدَّمِ

নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের রক্তনালীর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। (সহিহ বুখারী: হাদীস নং ৩২৮১,সহিহ মুসলিম: হাদীস নং ২১৭৪)

এভাবে, নৈতিক দুর্বলতার অনেক কারণ আছে, যা একটি ব্যক্তির চরিত্র এবং আচার-আচরণকে ইসলামের আদর্শ থেকে সরে যেতে বাধ্য করে।

আল-কুরআনে নৈতিকতার গুরুত্ব

ইসলামে নৈতিকতার গুরুত্ব তুলে ধরে কুরআন এবং হাদিসে বেশ কিছু নির্দেশনা রয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বারবার কুরআনে বলেছেন যে, মানুষের জীবনে সততা ও সৎকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম, এবং এর মাধ্যমেই সত্যিকারের শান্তি ও জান্নাতের দিকে পথপ্রদর্শন করা সম্ভব।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন

- "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا" (সূরা আল-বাকারা, ২:২৫) "যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নীচ দিয়ে নদের স্রোত প্রবাহিত হয় এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।" এখানে আল্লাহ তাআলা নৈতিক শক্তির দ্বারা অর্জিত সৎকর্মের ফলস্বরূপ জান্নাতের কথা বলেছেন।
- " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا(৩৩:৭০ ,সূরা আল-আহযাব) " "হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সৎ কথা বলো।" এখানে আল্লাহ তাআলা সততার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন, যা একজন মুসলিমের ভাষা ও কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়া উচিত।
- "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ" (সূরা আত-তাওবা, ৯:৭১) "বিশ্বাসী পুরুষ ও মহিলা একে অপরের সহায়ক, তারা সৎকাজে সাহায্য করে এবং অন্যদেরকে অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে।" এখানে নৈতিক সহযোগিতা এবং ইসলামী আদর্শের প্রতি আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে।

হাদিসে নৈতিকতার গুরুত্ব

- "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ"

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই সততা ভালো কাজের দিকে নিয়ে যায়, আর ভালো কাজ জান্নাতে পৌঁছে দেয়।" সূত্র: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২১৪। এই হাদীসে বোঝানো হয়েছে যে, একজন ব্যক্তি যখন সত্য কথা বলে এবং প্রতিটি কাজে সত্যনিষ্ঠ থাকে, তখন তা ধীরে ধীরে তাকে নেক আমলের দিকে পরিচালিত করে। সেই নেক আমল, যেমন দয়া, সহানুভূতি, ইবাদত ও

সৎচরিত্র-সব মিলে তাকে জান্নাতের উপযুক্ত করে তোলে। এটি একটি ধারাবাহিক উন্নতির পথ, যেখানে সত্য একজন মানুষকে নৈতিক উৎকর্ষতার শিখরে পৌঁছে দেয়।

- "إِنَّ الصِّدْقَ يُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ" অনুবাদ: "সত্যবাদিতা জান্নাতে পৌঁছে দেয়।" সূত্র: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৪৮। এই হাদীসটি খুব সংক্ষিপ্ত হলেও এর তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। এখানে বলা হয়েছে, একটি মাত্র গুণ-সত্যবাদিতা-মানুষকে জান্নাতের পথে নিয়ে যেতে পারে। একজন মানুষ যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যের উপর অটল থাকে, তবে আল্লাহর নিকট সে সম্মানিত হয় এবং পরকালে জান্নাত লাভ করে। এটি আমাদের শিক্ষা দেয়, সত্য হচ্ছে এমন একটি গুণ যা একা অনেক পাপ ও দুর্নীতি থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে।
- "مَنْ يَحْتَسِبُ فِي قَلْبِهِ أَنْ يُصَارِحَ النَّاسَ فَيَمْشِي فِي النَّاسِ بِحُسْنِ النِّيَّةِ" অনুবাদ: "যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে লোকদের প্রতি আন্তরিক থাকবে এবং ভালো নিয়তে সমাজে চলবে।" সূত্র: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৮৮

এই হাদীস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, একজন প্রকৃত মুসলিম শুধু বাহ্যিক আচরণে ভালো নয়, বরং তার অন্তরেও থাকা উচিত শুদ্ধ নিয়ত ও আন্তরিকতা। মানুষ যখন ভালো উদ্দেশ্যে সমাজে চলাফেরা করে, কারো ক্ষতি না করে বরং উপকার করার মানসিকতা রাখে, তখন সেই আচরণই তার ইমানের প্রকাশ হয়ে দাঁড়ায়। এই হাদীস মানুষের সামাজিক আচরণ, আন্তরিকতা ও নৈতিক সৌন্দর্যের গুরুত্ব তুলে ধরে।

নৈতিক দুর্বলতার প্রভাব

একজন ব্যক্তির নৈতিক দুর্বলতা তার চরিত্র এবং সমাজের জন্য গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যখন একটি সমাজে অধিকাংশ মানুষ নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন তা সামগ্রিকভাবে একটি বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে। নামাজ ও রোজার মতো ইবাদতগুলোতে অবহেলা, হারাম কাজের প্রতি প্রবণতা, এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিষ্টাচারের অভাব সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং, নৈতিক দুর্বলতা শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবন নয়, বরং পুরো সমাজের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

৪.২ নফসের কুপ্ররোচনা ও চাহিদার অনুসরণ

মানুষের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত একটি শক্তি হলো **নফস**-যা একদিকে ভালো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারে, আবার অপর দিকে খারাপ প্রবৃত্তির দিকেও টানতে পারে। যখন নফস আল্লাহভীতির অধীনে থাকে, তখন তা আত্মশুদ্ধির মাধ্যম হয়; কিন্তু যখন নফস তার কুপ্রবৃত্তি ও চাহিদার অনুসরণ করে, তখন তা আমলি অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

- আল্লাহ তাআলা বলেন:**"নিশ্চয়ই নফস (প্রবৃত্তি) মানুষকে মন্দ কাজের আদেশ দেয়..."** *(সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৩)।* এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, যদি নফসকে নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তাহলে এটি আমল নষ্ট করে দেয় এবং মানুষকে গুনাহ ও অলসতার দিকে টেনে নেয়।
- রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:**"প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।"** *(তিরমিযী, হাদীস: ১৬২১)* এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, নফসের চাহিদাকে দমন করা আসলেই কঠিন, কিন্তু তা না করলে আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ গাফলতির শিকার হয়।

নফসের কিছু সাধারণ কুপ্ররোচনার দিক

১. অলসতা ও ইবাদতের প্রতি বিরক্তি: নফস মানুষকে সবসময় আরাম ও বিশ্রামের দিকে নিয়ে যেতে চায়। ফলে ইবাদত যেমন নামাজ, রোজা, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি করার সময় মনে হয় এগুলো কষ্টসাধ্য ও ক্লান্তিকর কাজ। নামাজের সময় অলসতা এসে যায়, কুরআন পড়তে ইচ্ছে হয় না, রোজা রাখাও কঠিন মনে হয়। এ অলসতা ধীরে ধীরে আমলি অধঃপতনের প্রথম ধাপ হয়ে দাঁড়ায়।

২. অবৈধ আনন্দের আকর্ষণ: নফস সহজেই এমন আনন্দ ও স্বস্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, যেগুলো শরিয়তসম্মত নয়। যেমন: গান-বাজনা, অশ্লীল ভিডিও দেখা, হারাম সম্পর্ক তৈরি করা বা

অনৈতিক কাজ থেকে মজা খোঁজা। এগুলো তাৎক্ষণিক সুখ দেয়, কিন্তু আত্মাকে ধ্বংস করে। হারাম আনন্দের প্রতি আকর্ষণ ইমানকে দুর্বল করে ফেলে।

৩. বিলাসিতা ও অহঙ্কারে তৃপ্তি: নফস বিলাসিতা ও সমাজে প্রভাব দেখিয়ে গর্ববোধ করতে চায়। দামি পোশাক, প্রযুক্তি, খাওয়া-দাওয়া বা বড় বাড়ি-এসবের পেছনে দৌড়ায় মানুষ, আর এতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে চায়। এমন অহঙ্কার মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে তোলে, ফলে আমল হারিয়ে যায়। অহঙ্কার তো এমন গুনাহ, যা শয়তানকেও ধ্বংস করেছে।

৪. দুনিয়াবি মোহে মগ্নতা: নফস সবসময় দুনিয়ার সৌন্দর্য, সম্মান, সম্পদ ও আরামকে বড় করে দেখে। এতে মানুষ পরকাল ভুলে যায়, ফলে আমল ও ইবাদতের গুরুত্ব তার কাছে তুচ্ছ হয়ে পড়ে। দুনিয়ার মোহে মগ্ন ব্যক্তি সময়কে ইবাদতের বদলে ভোগ-বিলাসে ব্যয় করে।

৫. আল্লাহর অবাধ্যতায় আরাম অনুভব: নফস এমন একটি অবস্থা তৈরি করে, যেখানে হারাম কাজ করলেও মনে হয়, এতে কোনো সমস্যা নেই। গুনাহকে গুনাহ মনে না করা সবচেয়ে বিপজ্জনক। একপর্যায়ে মানুষ গুনাহ করেও অনুতপ্ত হয় না, বরং সেটাতে শান্তি ও আনন্দ অনুভব করে। এটা ইমানের গভীর দুর্বলতার প্রকাশ এবং আমলি অধঃপতনের চূড়ান্ত রূপ।

উপরের প্রতিটি দিকই প্রমাণ করে যে, নিয়ন্ত্রণহীন নফস আমল নষ্ট করে দেয়, ইমান দুর্বল করে এবং মানুষকে ধীরে ধীরে অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাই আত্মশুদ্ধির জন্য নফসের এই কুপ্ররোচনাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই সবচেয়ে জরুরি।

নফসের কুপ্ররোচনা থেকে বাঁচতে করণীয় -

- **নিয়মিত তাওবা ও ইসতিগফার** করতে হবে
- **তাকওয়া ও আল্লাহভীতি** সৃষ্টি করতে হবে
- **কুরআন তেলাওয়াত** ও অর্থ অনুধাবন করে অন্তর পরিশুদ্ধ করতে হবে
- **আত্মপর্যালোচনা (মুহাসাবা)** করতে হবে প্রতিদিন
- **সৎ সঙ্গ** গ্রহণ করতে হবে এবং খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে

৪.৩ অসৎ সঙ্গ ও খারাপ পরিবেশ

আমলি অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো অসৎ সঙ্গ এবং খারাপ পরিবেশ। মানুষের চারপাশের সঙ্গতি এবং পরিবেশ তার চরিত্র, মানসিকতা, এবং দ্বীনী অবস্থার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। সৎ সঙ্গের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনকে উন্নত করতে পারে, কিন্তু খারাপ সঙ্গ তার অন্তরে অশান্তি, দ্বীনী অবক্ষয় এবং আমল নিয়ে অবহেলা সৃষ্টি করতে পারে।

অসৎ সঙ্গের প্রভাব

- **সৎ সঙ্গের অভাব:** খারাপ সঙ্গ মানুষের অন্তরে নফসের কুপ্ররোচনাকে বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে সে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে যায়। আল্লাহ বলেন, "وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا।"

"তোমরা এমন সঙ্গী খুঁজো যারা তোমাদের ঈমান ও আমলে সহায়ক হবে।"

(সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৫৮) খারাপ সঙ্গের মধ্যে থাকতে থাকলে, একজন ব্যক্তি সহজেই গুনাহে জড়িয়ে পড়তে পারে এবং আল্লাহর প্রতি তার শ্রদ্ধা কমে যেতে পারে।

- **বিষাক্ত প্রভাব**: অসৎ সঙ্গের মধ্যে থাকলে, মানুষ নিজে খারাপ আচরণ, গুনাহ এবং অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, যা এক সময় তার জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিবেশ তার আমলের প্রতি বিরক্তি তৈরি করে এবং জীবনকে অর্থহীন মনে হতে পারে।
- **মনের দুর্বলতা:** খারাপ সঙ্গ মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়। তারা ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে এবং মন্দ কাজকে ভাল মনে করতে শুরু করতে পারে। ফলে, ধর্মীয় এবং নৈতিক মূল্যবোধের পতন ঘটে।

খারাপ পরিবেশের প্রভাব

- **ধর্মীয় অবহেলা:** খারাপ পরিবেশ, যেখানে ইসলামিক শিক্ষার অভাব থাকে বা সেখানে ইসলামিক মূল্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধা থাকে, মানুষের ধর্মীয় চেতনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে, একজন মুসলিম ব্যক্তি ইবাদত, দোয়া, তাওবা এবং ইলমে নাফি (বিশুদ্ধ জ্ঞান) থেকে দূরে সরে যেতে পারে।
- **প্রভাবিত মানসিকতা:** খারাপ পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশু বা তরুণ-তরুণীরা নিজেদেরকে সঠিকভাবে শিষ্টাচারে এবং ইসলামী মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়। তাদের জীবনে অপরাধ প্রবণতা এবং অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়।
- **ইসলামিক মূল্যবোধের প্রতি অবহেলা:** খারাপ পরিবেশ একজন ব্যক্তির কাছে ইসলামের গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পারে এবং তিনি ভুল পথ অনুসরণ করতে পারেন। ফলে, এমন পরিবেশ তাকে আল্লাহর রাহ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে পারে।

করণীয়

- **সৎ সঙ্গ গ্রহণ:** সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো সৎ সঙ্গ নির্বাচন করা। যারা আল্লাহর পথে চলেন এবং দ্বীনি জ্ঞান রাখেন, তাদের সঙ্গ নিলে জীবনে শান্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন মুসলিমের উচিত ভালো বন্ধু ও সঙ্গী খুঁজে বের করা, যারা তাকে ধর্মের পথে চলতে উৎসাহিত করবে।
- **খারাপ সঙ্গ পরিহার করা:** যে কোনো পরিবেশ বা সঙ্গ, যা মানুষের দ্বীনের প্রতি ক্ষতিকর, সেটি পরিহার করা উচিত। আল্লাহ বলেন," وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب "অসৎ সঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখো না, তারা তোমাদের বিভ্রান্তি ও অশান্তি বৃদ্ধি করবে।"(সূরা আল-আনফাল, ৮:২৫) খারাপ সঙ্গের মধ্যে থাকা মানুষ সহজেই ভ্রান্ত ধারণায় আক্রান্ত হয়ে যায় এবং ঈমান ও আমল দুর্বল হয়ে পড়ে।
- **ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা:** পরিবার, বন্ধু বা কাজের পরিবেশে ইসলামের গুরুত্ব এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি করতে হবে। এমন পরিবেশ তৈরি করা জরুরি যেখানে ভালো আচরণ, দ্বীনি শিক্ষা এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখা হয়।
- **আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন:** খারাপ পরিবেশ এবং সঙ্গ থেকে বের হয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে গভীর করতে হবে। নিয়মিত তাওবা, ইসতিগফার, কুরআন তেলাওয়াত এবং যিকিরের মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা যায়। এইভাবে, খারাপ সঙ্গ এবং

পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার ধর্মীয় জীবনকে উন্নত করতে পারে এবং আমলি অধঃপতন থেকে রক্ষা পেতে পারে।

৪.৪ গুনাহ ও হারাম কাজে লিপ্ততা

গুনাহ (পাপ) এবং হারাম (অবৈধ) কাজের দিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়া মানুষের আমলি অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ। ইসলাম মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করে এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়।
আল্লাহ বলেন: "তোমরা এমন কাজ থেকে বিরত থাকো যা আল্লাহ হারাম করেছেন।" (সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৯৩)

গুনাহ ও হারাম কাজের ক্ষতিকর প্রভাব

গুনাহ ও হারাম কাজ মানুষের জীবনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। এগুলি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনকে ধ্বংস করে না, বরং তার পারিবারিক, সামাজিক এবং দুনিয়াবী জীবনেও বিশাল নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইসলাম গুনাহ ও হারাম কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য বারবার সতর্ক করেছে, কারণ এর ক্ষতিকারক প্রভাব অসীম। এখানে, গুনাহ ও হারাম কাজের কিছু প্রধান প্রভাব বিশদভাবে আলোচনা করা হলো:

১. আত্মিক দুর্বলতা ও ঈমানের ক্ষতি

গুনাহ এবং হারাম কাজের প্রধান ক্ষতিকারক প্রভাব হচ্ছে আত্মিক দুর্বলতা। যখন একজন ব্যক্তি গুনাহ করে, তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় কমে যায় এবং ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। ফলে, তার প্রার্থনা এবং ইবাদত কেমন যেন ফাঁকা হয়ে যায়, কারণ পাপের কারণে তার অন্তর আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর শক্তি হারিয়ে ফেলে।
আল্লাহ বলেন, "বরং তাদের হৃদয়ে যা ছিল তা তাদের কাজের কারণে মলিন হয়ে গেছে।" (সূরা আল-মুতাফফিফিন, ৮৩:১৪) এখানে গুনাহ ও পাপের কারণে মানুষের অন্তর অশুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

২. আখিরাতে শাস্তি

গুনাহ ও হারাম কাজের কারণে একজন ব্যক্তি পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে। কুরআন এবং হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে, গুনাহের কারণে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন, যদি না কেউ তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে।

- আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৭)
- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি গুনাহ করে এবং তাওবা না করে, তার জন্য পরকালে শাস্তি রয়েছে।" (সহীহ মুসলিম)

৩. পারিবারিক জীবনে অশান্তি

গুনাহ ও হারাম কাজের কারণে পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয়। পিতা-মাতা বা স্বামী-স্ত্রী যদি গুনাহে লিপ্ত হন, তা তাদের সম্পর্কের মধ্যে অশান্তি, কলহ ও দূরত্ব সৃষ্টি করে। এমনকি সন্তানদের জন্যও এটি খারাপ উদাহরণ তৈরি করে, যা তাদেরও গুনাহে প্রবৃত্ত হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়।

আল্লাহ বলেন, "তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।" (সূরা আত-তাহরিম, ৬৬:৬) এখানে আল্লাহ মুমিনদেরকে গুনাহ থেকে বিরত থাকার এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪. সামাজিক জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব

গুনাহ এবং হারাম কাজের পরিণতিতে সমাজের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। সমাজে যখন অনেক মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়, তখন তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা, অসত্য প্রচার, অশ্লীলতা ও সামাজিক অস্থিরতা বাড়তে থাকে। এতে সমাজের শৃঙ্খলা ও শান্তি ধ্বংস হয়।

রাসূল (সা.) বলেছেন, "যখন একটি জাতি তাদের মধ্যে গুনাহ করতে থাকে, তখন তারা আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হয়।" (ইবনে মাজাহ) এখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে যে, গুনাহের কারণে সমাজের মধ্যে অশান্তি এবং শাস্তি আসতে পারে।

৫. স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রায় প্রভাব

গুনাহ এবং হারাম কাজ, বিশেষ করে শারীরিকভাবে ক্ষতিকারক কাজ যেমন মদ্যপান, সিগারেট খাওয়া, যৌন অবৈধ সম্পর্ক ইত্যাদি মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করতে পারে।

এগুলি শুধুমাত্র আত্মিক ক্ষতির কারণ নয়, শারীরিক রোগ যেমন ক্যান্সার, হার্ট ডিজিজ, ডায়াবেটিস, এবং মানসিক অবসাদ সৃষ্টি করতে পারে।
আল্লাহ বলেন, "তোমরা নিজের হাতে নিজেদের মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি কোরো না।" (সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৯৫) এখানে আল্লাহ মানুষের জন্য নিজের স্বাস্থ্য ও জীবনকে রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং গুনাহের মাধ্যমে তা ধ্বংস করার প্রতিরোধ করার আহ্বান করেছেন।

৬. আত্মবিশ্বাসের হ্রাস

গুনাহ এবং হারাম কাজের পরিমাণ বাড়লে, মানুষের আত্মবিশ্বাসও কমে যায়। যখন মানুষ জানে যে সে গুনাহ করছে, তখন তার মনে একটি অনির্দিষ্ট ভয় ও দুশ্চিন্তা তৈরি হয়। এই অনিশ্চয়তা তাকে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে এবং তাকে হতাশ করে।

৭. আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকা

গুনাহ ও হারাম কাজের কারণে একজন ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে দূরে চলে যায়। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষায় জানা যায় যে, যারা গুনাহে লিপ্ত থাকে, তাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না। আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহর পথে চলে, তাদের উপর আল্লাহ রহমত দেন।" (সূরা মুমিন, ৪০:৭৫) এখানে আল্লাহ বলছেন যে, যারা সৎপথে চলে এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকে, তাদের উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত আসে।

৮. তওবা ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

গুনাহ ও হারাম কাজের প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো তওবা করা এবং আল্লাহর কাছে ফিরে আসা। তওবা শুধুমাত্র সঠিক দিকনির্দেশনা নয়, বরং এটি একজন ব্যক্তির হৃদয়কে শুদ্ধ করে এবং তাকে পুনরায় সৎ পথে পরিচালিত করে।
আল্লাহ বলেন, "তবে যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে, তারা এক নতুন জীবন পাবে।" (সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৭০)

৪.৫ আল্লাহভীতি ও তাকওয়ার অভাব

আল্লাহভীতি এবং তাকওয়া ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এগুলি একজন মুসলিমের আধ্যাত্মিক জীবনের মূল স্তম্ভ। যখন একজন ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহভীতি এবং তাকওয়ার অভাব

থাকে, তখন তার আমল (কর্ম) এবং জীবনযাত্রায় বেশ কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ইসলামের দৃষ্টিতে, আল্লাহভীতি বা তাকওয়া না থাকার ফলে একদিকে যেমন আত্মিক ক্ষতি হয়, অন্যদিকে এটি ব্যক্তির পারিবারিক, সামাজিক, এবং দুনিয়াবী জীবনের উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে।

১.আধ্যাত্মিক দুর্বলতা

যখন একজন ব্যক্তি আল্লাহভীতি এবং তাকওয়া থেকে বঞ্চিত হয়, তখন তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় এবং শ্রদ্ধা কমে যায়। এর ফলস্বরূপ, সে সৎকাজে মনোনিবেশ করতে পারে না, পাপ এবং গুনাহের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর ফলে তার ইবাদত, বিশেষ করে সালাতের মধ্যে খুশু (মনের শান্তি) এবং কল্পনা থাকে না, যা তার আধ্যাত্মিক জীবনকে দুর্বল করে দেয়। আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহর ভয় করো, তিনি তোমাদের পরিশুদ্ধ করবেন এবং তোমাদের জন্য হেদায়েত প্রদান করবেন।" (সূরা আল-নূর, ২৪:২১) এখানে আল্লাহ বলছেন যে, আল্লাহভীতি ও তাকওয়া মানুষের পরিশুদ্ধি এবং সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে।

২. পাপের প্রতি প্রবণতা বৃদ্ধি

তাকওয়া এবং আল্লাহভীতি না থাকার কারণে একজন ব্যক্তি সহজেই পাপ এবং গুনাহের দিকে চলে যায়। তার মন ও দৃষ্টি হারিয়ে যায় এবং তাকে তার দুনিয়াবী কামনা-বাসনার প্রতি প্রবৃত্তি হতে থাকে। এর ফলে, সে আল্লাহর হুকুম থেকে বিচ্যুত হয়ে পাপী জীবন যাপন করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তুমি যখন আল্লাহর ভয় করবে, তখন তোমার আমলগুলো শুদ্ধ হবে এবং আল্লাহ তোমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।" (সহীহ মুসলিম) এখানে রাসূল (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহভীতি বা তাকওয়ার মাধ্যমে মানুষের আমল শুদ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে সৎপথে পরিচালিত করা হয়।

৩. বিশ্বাস ও ঈমানের দুর্বলতা

তাকওয়ার অভাব ঈমানের দুর্বলতা সৃষ্টি করতে পারে। যেহেতু ঈমান এবং আল্লাহভীতি একে অপরের পরিপূরক, যদি একজনের মধ্যে আল্লাহভীতি না থাকে, তার ঈমানও দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে, তার আস্থা ও বিশ্বাসের মাত্রা কমে যায়, এবং সে নিজের বিশ্বাসের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে।

৪. পারিবারিক জীবনে অশান্তি

যখন একজন ব্যক্তি আল্লাহভীতি এবং তাকওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে, তখন তার পরিবারের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় এবং অশান্তি সৃষ্টি হয়। সে তার পরিবার এবং সন্তানদের সঠিকভাবে গাইড করতে পারে না। ফলে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দ্বীনি মূল্যবোধের অভাব দেখা দেয় এবং পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও কলহ বৃদ্ধি পায়।

৫. সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব

তাকওয়ার অভাব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ঘটাতে পারে। একজন ব্যক্তি যখন আল্লাহভীতি এবং তাকওয়া থেকে দূরে থাকে, তখন সে সামাজিকভাবে অসতর্ক এবং অশালীন আচরণ প্রদর্শন করতে পারে, যা সমাজে অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা এবং অশ্লীলতা বৃদ্ধি করে।

৬. কুরআন ও হাদীসের প্রতি অবহেলা

আল্লাহভীতি এবং তাকওয়া না থাকার কারণে, একজন ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসের প্রতি অবহেলা করতে শুরু করে। সে কুরআন এবং রাসূল (সা.)-এর আদর্শকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজস্ব ইচ্ছা ও চিন্তা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে থাকে।

৭. আখিরাতের শাস্তির আশঙ্কা

তাকওয়া ও আল্লাহভীতির অভাব একদিকে যেমন দুনিয়াতে সমস্যা সৃষ্টি করে, অন্যদিকে আখিরাতে কঠিন শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহভীতি ও তাকওয়া না থাকলে, একজন ব্যক্তি পরকালেও আল্লাহর শাস্তির মুখোমুখি হতে পারে। আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহর ভয় করে, তাদের জন্য পরকালীন পুরস্কার রয়েছে।" (সূরা আল-আল-ইমরান, ৩:১৩)

এখানে আল্লাহ বলছেন, যারা আল্লাহভীতি ও তাকওয়ার পথে চলে, তাদের জন্য আখিরাতে পুরস্কার অপেক্ষা করছে।

৪.৬ পরকাল সম্পর্কে গাফিলতা

- **পরকাল সম্পর্কিত ভুল ধারণা:**এটি এমন একটি সমস্যা যা একজন মুসলিমকে তার মূল উদ্দেশ্য ভুলে যেতে বাধ্য করে। মুসলিমদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও পরকালকে অগ্রাধিকার দেবে। তবে, অনেক সময় মানুষ পরকাল সম্পর্কে গাফিল হয়ে যায় এবং দুনিয়াতে মগ্ন হয়ে থাকে। এর ফলে, তারা পরকাল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ভুলে যায়, যেমন আখিরাতের শাস্তি, জান্নাতের আনন্দ, ও জান্নাত এবং জাহান্নামের পরিণতি।

আল্লাহ বলেন, " وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" (সূরা লুকমান, ৩১:৩৪) অর্থ: "আর কোনো ব্যক্তি জানে না, সে আগামীকাল কী

উপার্জন করবে এবং কোনো ব্যক্তি জানে না, সে কোথায় মৃত্যু বরণ করবে। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু অবগত।"

- **দুনিয়ার প্রতি অতি আকর্ষণ:** একটি বড় কারণ হল দুনিয়াবী মোহ ও বিলাসিতার প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ। মানুষ যখন দুনিয়ার প্রতি একেবারে মগ্ন হয়ে যায়, তখন পরকাল সম্পর্কে চিন্তা করার সময় পায় না। তার মনোযোগ সমস্ত জীবিকা, স্বার্থ, বিনোদন এবং ভোগের দিকে চলে যায়। ফলে, তার আখিরাতের দিকে মনোযোগ কমে যায় এবং সে পরকাল সম্পর্কে গাফিল থাকতে থাকে।

আল্লাহ বলেন, "إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ" (সূরা আন-নামল, ২৭:৪)

অর্থ: "যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, আমরা তাদের কর্মকে সুন্দর করে দেখিয়েছি, ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।"

- **পরকালকে গুরুত্বপূর্ণ না ভাবা:** অনেক মানুষ মনে করেন যে পরকাল তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয় বা তা আসলে তাদের জীবনে কোনও ভূমিকা রাখে না। তারা বিশ্বাস করে যে, এই দুনিয়াতেই তাদের জীবনের সমস্ত কিছু পূর্ণ হবে এবং পরকাল বা আখিরাতের কোনো বাস্তবতা নেই। এটি একটি বড় ভুল ধারণা যা মানুষের আধ্যাত্মিক অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "مَنْ أَصْبَحَ لَا يُهَاجِرُ إِلَّا لِلدُّنْيَا فَقَدْ جَفَا" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নম্বর ৭০৪০) অর্থ: "যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য সবকিছু করবে এবং আখিরাতের দিকে মনোযোগী হবে না, সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে না।"

- **সৎকর্ম ও পরকালের প্রস্তুতি:** পরকাল সম্পর্কিত গাফিলতার জন্য একজন মুসলিমের উচিত, নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং পরকাল সম্পর্কে সচেতন হওয়া। কুরআন এবং হাদীসের শিক্ষা অনুসারে, একজন মুসলিম তার সময় এবং জীবনের প্রতিটি অংশকে আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করবে। তার কর্ম, বিশ্বাস, এবং ইবাদত সব কিছু আখিরাতের দিকে নিবদ্ধ থাকবে।

আল্লাহ বলেন, "وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَدْعُوا لِيَعُودَكُمْ وَيُؤْمِنُوا لَكُم" (সূরা আল-ইমরান, ৩:১২)। অর্থ: "তোমরা কেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখবে না, এবং তোমরা বিশ্বাস করবে না যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য রহমত ও দয়া দান করবেন।"

- **আখিরাতের চিন্তা প্রতিদিনের জীবনে প্রতিফলিত করা:** একজন মুসলিমের জন্য প্রতিদিনের জীবনে আখিরাতের কথা মনে রাখা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করা অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য একজন মুসলিমের উচিত যথাসম্ভব সৎ কাজ করা,

দৈনিক ইবাদত বিশেষত সালাতের প্রতি খুশু রাখা এবং তার জীবনকে আল্লাহর নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।

- **পরকাল সম্পর্কে শিক্ষার অভাব:** অনেক সময় মানুষ পরকাল সম্পর্কে শিক্ষা লাভে গাফিল থাকে। ইসলাম পরকালকে অবহেলা করার অনুমতি দেয় না, বরং সবার কাছে পরকাল সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। যদি একজন মুসলিম পরকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন, তবে তার জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে এর বাস্তব প্রভাব পড়বে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "ِإِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ فَقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ خَابَ قَلْبُهُ فَاسْتَحَقَّ الْجَنَّةَ" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নম্বর ৩৭৮) অর্থ: "যদি একজন ব্যক্তি অসুস্থ হয় এবং সে বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তবে তার অন্তর খালাস পাবে এবং সে জান্নাতের অধিকারী হবে।"

৪.৭ ইলমের অভাব ও জাহিলি মানসিকতা

- **ইলমের গুরুত্ব:** ইসলামে জ্ঞান বা ইলম অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। কুরআন ও হাদীসে ইলমের প্রাপ্তির উপরে জোর দেয়া হয়েছে, কারণ এটি মানুষের জীবনে সঠিক দিশা ও পথ নির্দেশনা দেয়। ইলমের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করতে পারে। আল্লাহ বলেন, “ইয়াক্বীনপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করো, কারণ যাদের জানে, তাদের সন্মান আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধি করেন।”

“ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ(সূরা আজ-জুমার, ৫৯: ৯৯) ”ِ

অর্থ: "বল, জানে এমন লোক এবং জানে না এমন লোক সমান হতে পারে না।"

- **জাহিলি মানসিকতা:** জাহিলি মানসিকতা হল অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং ভুল ধারণার ভিত্তিতে জীবন যাপন করা। এটি এমন একটি মানসিক অবস্থা যেখানে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশনা বা সঠিক জ্ঞান থেকে বিচ্যুত হয়ে অজ্ঞতার মধ্যে জীবন যাপন করে। জাহিলি মানসিকতা মানুষের চিন্তা ও কর্মের ভুল দিক দিয়ে পরিচালিত হয়, এবং এটি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মাঝে মাঝে তোমরা এমন লোকদের মতো হয়ে যাবে, যারা পূর্বের যুগে জাহিলি আমলের ওপর ছিলেন।" (সহীহ মুসলিম)
- **জ্ঞান অর্জনের প্রতিপাদ্য:** ইসলাম প্রতিটি মুসলিমকে জ্ঞান অর্জন করতে উৎসাহিত করেছে, বিশেষ করে ধর্মীয় জ্ঞান। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো ইলম অর্জন করা এবং তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলতে এবং

আখিরাতে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "ইলম অর্জন প্রতিটি মুসলিম পুরুষ ও মহিলার উপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)

- **ইলম অর্জনের প্রভাব:** যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে, তার জীবনে পরিবর্তন আসে। সে সঠিক পথে চলতে সক্ষম হয় এবং তার সমাজেরও উপকার হয়। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং ধর্মীয় জীবনের উপর দৃঢ় মানসিকতা গড়ে ওঠে, এবং ব্যক্তি জাহিলি চিন্তা-ধারণা থেকে মুক্তি পায়। রাসূল (সা.) বলেছেন, "ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি ও হেদায়াত প্রদান করে।" (সহীহ বুখারি)

৪.৮ দুনিয়ার মোহ ও বিলাসিতার আসক্তি

দুনিয়ার মোহ এবং বিলাসিতার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি একজন মুসলিমের আধ্যাত্মিক জীবনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইসলামে, দুনিয়া শুধুমাত্র পরীক্ষার স্থান হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং তার প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা ও মোহ মুমিনদের আখিরাতের পথ থেকে সরে যেতে পারে। অনেক সময় মানুষ দুনিয়াকে এত বেশি গুরুত্ব দেয় যে, সে পরকাল বা আল্লাহর নির্দেশনা ভুলে যায়। এই দুনিয়াবী মোহ এক ধরনের মানসিক অন্ধত্ব সৃষ্টি করে, যার ফলে ব্যক্তি তার জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে যায় এবং সময়ের অপচয় হয়।

দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্তির জন্য একজন মুসলিমকে সতর্ক থাকতে হবে এবং তার জীবনকে ইসলামী শিক্ষার আলোকে পরিচালিত করতে হবে। আল্লাহ এবং রাসূলের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে, যেখানে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা থাকবে, তবে তা সীমিত এবং পরকালকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

- কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,
  "زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ" (সূরা আল-ইমরান, ৩:১৪)

অর্থ: "মানুষের জন্য সুন্দর করা হয়েছে মহিলাদের, পুত্রসন্তানদের, সঞ্চিত সোনামুক্তা, রৌপ্য, সজ্জিত ঘোড়া, চতুষ্পদ প্রাণী এবং কৃষিজমি। এরা হল দুনিয়ার উপভোগ্য বস্তু। কিন্তু আল্লাহর কাছে রয়েছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।" (সূরা আল-ইমরান, ৩:১৪)

- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ" (সুনান তিরমিজি, হাদিস নং ২৩৩৬)

অর্থ: "প্রতিটি জাতির জন্য একটি ফিতনা রয়েছে, আর আমার উম্মতের ফিতনা হলো সম্পদ।" সুনান তিরমিজি, হাদিস নং ২৩৩৬

- রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন,

"مَا فَتَحْتُ لَكُمْ مِّنَ الدُّنْيَا فَإِنَّ مَا لَكُمْ فِيهَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ إِلَّا كَمَا يَكُونُ رَجُلٌ مِنْكُمْ فِي دَارٍ لَكَ لِيَنْقَضِ فِيهَا وَأَمَّا أَنْتُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَرُونَ فِي أَعْيُنِكُمْ فِي ذَٰلِكَ فَحَتَّى تَرَاءُوا فِيهِ فَتَمُوتُون ٍ" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৫১)

অর্থ: "যে দুনিয়া আমি তোমাদের জন্য খুলে দিয়েছি, তা তোমাদের জন্য কোন মূল্য নেই। যদি তোমরা এটাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার কর, তবে তোমরা জান্নাতের দিকে চলে যাবে, যদি না তোমরা জান্নাতের দিকে চলে যাও, তবে তোমাদের পার্থিব জীবন অনর্থক হবে।" সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৫১

এই আয়াত এবং হাদীসগুলো দুনিয়ার মোহ ও বিলাসিতার প্রতি মানুষের আসক্তি এবং এর পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই মোহ থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং তার মনোযোগ পরকাল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে নিবদ্ধ করতে হবে।

৪.৯ হারাম আহার ও উপার্জন

ইসলামে, খাদ্য গ্রহণ এবং উপার্জন করার ক্ষেত্রে বৈধতার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য সব ধরনের খাদ্য ও উপার্জনকে হালাল করেছেন, তবে কিছু কিছু খাবার এবং উপার্জনকে হারাম ঘোষণা করেছেন। হারাম আহার এবং উপার্জন গ্রহণ করা মুসলিমের আধ্যাত্মিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং তার পরকালেও ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

হারাম উপার্জন এবং খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে যাওয়া এক ধরনের অপরাধ। এটি মুসলিমের ইবাদত, দোয়া এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক কার্যাবলীকে অকার্যকর করে দেয়। হারাম উপার্জন যেমন সুদ, মিথ্যাচার, জালিয়াতি, এবং মন্দ কাজের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ-এই সব কিছু ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "مَنْ يَكْسِبُ حَرَامًا فَإِنَّ اللهَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِ جَنَّةً" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১০০৪) অর্থ: "যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করে, আল্লাহ তাকে জান্নাত হারাম করে দেন।" সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১০০৪

- রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, "إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১০০৬) অর্থ: "আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না।" সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০০৬

৪.১০ অলসতা, সময় অপচয় ও সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি

ইসলামে সময় অত্যন্ত মূল্যবান এবং এর সঠিক ব্যবহার আমাদের জীবন ও পরকালের সফলতার জন্য অপরিহার্য। তবে অনেক সময় আমরা অলসতা, সময় অপচয়, এবং সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহারে জড়িয়ে পড়ি, যা আমাদের ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব জীবনের জন্য ক্ষতিকর। আসুন, এই বিষয়গুলোকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি:

১. অলসতা

অলসতা বলতে আমরা এমন একটি অবস্থা বুঝি, যেখানে মানুষ কোনো কাজ করতে ইচ্ছুক হয় না বা কাজ করা থেকে বিরত থাকে। এটি সাধারণত দেহের শিথিলতা, মনোবলহীনতা এবং উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপনের প্রভাব। ইসলামে অলসতা খুবই নেতিবাচক হিসেবে দেখা হয়েছে, কারণ এটি আল্লাহ তায়ালার দেয়া সময়ের অপব্যবহার এবং জীবনের লক্ষ্যহীনতা তৈরি করে।

আল্লাহ বলেন: "وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى" **অর্থ: আর মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়।**সূরা আন-নাজম (৫৩:৩৯) এই আয়াতটি ইসলামের কর্মমুখী জীবনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এখানে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অলসতা ও নিষ্ক্রিয়তার কোনো স্থান ইসলামে নেই। একজন মানুষের সফলতা, তার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তার নিজ প্রচেষ্টা ও সাধনার উপর। এই আয়াতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, দায়িত্ববোধ ও পরিশ্রমের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয়-ইমানের দাবি কেবল মুখে উচ্চারণ নয়, বরং তা বাস্তব জীবনে সৎ আমলের মাধ্যমে প্রতিফলিত হওয়াই ইসলামের মূল দর্শন। সুতরাং অলসতা ত্যাগ করে সর্বদা চেষ্টা ও পরিশ্রমে মনোনিবেশ করাই একজন মু'মিনের পথ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَه" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২২১১) অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কাজ করে, তখন সে তা সুন্দরভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে করে।" এ হাদিসটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় যে, একজন

মুসলিমের জন্য অলসতা পরিহার করা এবং প্রতিটি কাজের প্রতি যত্নশীল হওয়া জরুরি। অলসতা আমাদের জীবনে কোনো উন্নতি বা সুফল আনতে পারে না।

২. সময় অপচয়

সময় এমন একটি মূল্যবান সম্পদ যা একবার চলে গেলে কখনো ফিরে আসে না। ইসলামে সময়ের প্রতি গুরুত্ব অনেক বেশি, কারণ এটি আমাদের দুনিয়া ও পরকালের সাফল্য নির্ধারণ করে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন: "وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ" (সূরা আল-আস্র, ১০৩:১-২) অর্থ: "সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই মানবজাতি ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।"

এই আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, সময়কে গুরুত্ব না দেওয়া এবং অপচয় করা আমাদের ক্ষতির কারণ হতে পারে। সময়ের অপব্যবহার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ক্ষতি করতে পারে, যেমন আধ্যাত্মিক ক্ষতি, পারিবারিক সমস্যা, বা ব্যক্তিগত জীবনে অসুখীতা।

তাছাড়া,সময় অপচয়ের ফলে মানুষের ইবাদত ও কাজের প্রতি মনোযোগ কমে যায়। এর ফলে মানুষের ঈমান দুর্বল হতে পারে এবং আল্লাহর কাছ থেকে দুঃখ বা অভিশাপ আসতে পারে। **উদাহরণ**:যেমন, কেউ দিনের বড় সময় মোবাইলে কাটায়-নামাজ, কুরআন, বা পড়াশোনার সময় থাকে না। এতে সে ধীরে ধীরে ইবাদত বিমুখ হয়ে পড়ে এবং জীবনে শান্তি হারায়।

৩. সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি

আজকের যুগে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জীবনের একটি অংশ হয়ে উঠেছে, কিন্তু এর অতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের সময় নষ্ট করতে পারে এবং আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে সরে যেতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক সময় সময়ের অপচয় হয়, যেখানে মানুষ অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে বা ভিডিও দেখে। ইসলামে এমন কিছু বলা হয়েছে যা আমাদের অপ্রয়োজনীয় এবং সময় অপচয়কারী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং ৬৪৯৫) অর্থ: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে, সে যেন ভাল কথা বলে, না হলে চুপ থাকে।" এ হাদিসটি আমাদের নির্দেশ দেয় যে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অসঙ্গত এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা চালানোর পরিবর্তে, আমাদের সুন্দর ও ইতিবাচক কথাবার্তা বলতে হবে অথবা চুপ থাকতে হবে। সময়ের অপচয়ের ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া বড় ভূমিকা পালন করে, যা অনেক সময় আমাদের আত্মবিশ্বাস, ঈমান এবং কর্মের প্রতি মনোযোগ কমিয়ে দেয়।

এছাড়া, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে অহংকার, প্রতিযোগিতা, এবং পরনিন্দা বেড়ে যেতে পারে। এটি আমাদের সম্পর্কগুলোও নষ্ট করতে পারে, এবং আমাদের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা ভুলে যেতে পারি।

৪.১১ অশ্লীলতা, গান-বাজনা ও চোখের হেফাজতের ব্যর্থতা

মানুষের হৃদয় এমন এক সূক্ষ্ম অস্তিত্ব, যা প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হয় তার চারপাশের দৃশ্য, শব্দ এবং আচরণ দ্বারা। হৃদয়ের গঠন এমনভাবে হয়েছে যে তা পবিত্রতা গ্রহণে সহজে নরম হয়, আবার অপবিত্র স্পর্শে কঠোর হতে সময় নেয় না। এই সূক্ষ্ম যন্ত্রটি যতই নির্মল থাকবে, ততই মানুষের চিন্তা, আচরণ ও অভিপ্রায় সুন্দর ও শান্তিময় হবে। তাই ইসলামে এসব আত্মবিনাশী উপাদানের বিষয়ে বারবার সতর্ক করা হয়েছে। অশ্লীলতা, গান-বাজনা ও দৃষ্টির লাগামহীনতা- এই তিনটি বিষয় একত্রে মানুষের অভ্যন্তরীণ গঠনকে এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যার ফলে ব্যক্তি ধীরে ধীরে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে, তার চিন্তা, সংবেদনশীলতা ও ইমান দুর্বল হতে থাকে, অথচ সে টেরই পায় না কখন ধসে পড়ে।

১.অশ্লীলতা

অশ্লীলতা প্রথমে চমৎকার সাজানো একটি মায়ার দরজা খোলে। সে দরজার ভিতরে রঙিন মোড়কে আবৃত থাকে চরিত্র-ভাঙার অন্ধকার। একবার সেই দৃষ্টিতে বা আচরণে প্রবেশ করা মাত্র, মানুষ তার অন্তরকে দূষিত হতে বাধ্য করে। সে দূষণ শুধু ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় সীমাবদ্ধ থাকে না, ধীরে ধীরে তার ভাষা, পোশাক, চালচলনে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এই ব্যক্তি সমাজে আরও মানুষকে সংক্রমিত করতে থাকে-অসাবধানভাবে হলেও। অশ্লীলতা নিজে কখনও একা আসে না। এটি নিয়ে আসে আত্মমর্যাদাহানির বোঝা, সম্পর্কের দুর্বলতা এবং পাপকে স্বাভাবিক করে তোলার প্রবণতা। একটা সময় আসে, যখন মানুষ পাপকে আর পাপ বলে অনুভব করে না। তার হৃদয় কালো হয়ে যায়, এবং সে আর ফিরে আসার পথ খুঁজে পায় না।

অশ্লীলতা হলো আত্মার নীরব শত্রু। প্রথমে সেটা নিরীহ মনে হয়-একটি দৃশ্য, একটি কথা, কিংবা একটি অঙ্গভঙ্গি। কিন্তু সে নীরব বিষ অন্তরের গভীরে নোংরা চিন্তার বীজ বপন করে। ***আল্লাহ তা'আলা বলেন:"তোমরা ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ***

এবং মন্দ পথ।" সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৩২। এই আয়াতে 'ধারে-কাছেও যেও না' বলে এক গণ্ডি টেনে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে পড়ে যায় সব ধরনের অশ্লীলতা-কথায়, পোশাকে, আচরণে, এবং দৃষ্টিতে।

২.গান-বাজনা: অন্তরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে

গান-বাজনা এমন এক আত্মিক আসক্তি তৈরি করে, যা মানুষকে ধীরে ধীরে নামাজ ও কুরআন থেকে বিমুখ করে। এর সুর ও ছন্দ হৃদয়ে প্রবেশ করে এমনভাবে, যে কুরআনের তেলাওয়াত তার কাছে ম্লান লাগে, নামাজ দীর্ঘ মনে হয়, আর ইবাদাত ভার হয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক এমন হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ্যপান ও গানকে হালাল মনে করবে।" সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫৫৯০

গান-বাজনা মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে খেলা করে। এ এক ধরনের সুরেলা ছলনা, যা ক্লান্ত অন্তরকে বিশ্রামের মোহ দেয়। কিন্তু সেই বিশ্রামে থাকে আত্মার নিস্তব্ধতা ভাঙার জন্য হাজারো অদৃশ্য হুল। শুরুটা নিরীহ সুর থেকে হলেও, ধীরে ধীরে তা আবেগকে অতিরঞ্জিত করে, বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত করে এবং একজন মানুষকে অলসতা, কল্পনার মোহ, এবং আত্মিক উদাসীনতায় ঠেলে দেয়। এই ধারা কখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। একসময় মনে হয়, নামাজের ধ্বনি সুর হয়ে গেছে, কুরআনের তেলাওয়াতের গভীরতা হারিয়ে গিয়েছে। হৃদয় এমন সুরে অভ্যস্ত হয়ে যায়, যে সুর অন্তরকে নরম করার বদলে গর্জন তুলে তার সংবেদনশীলতা ধ্বংস করে।

৩. চোখের হেফাজতের ব্যর্থতা: গোপন পাপের দরজা খুলে দেয়

চোখ হচ্ছে হৃদয়ের দরজা। মানুষ যা দেখে, তা অন্তরে গেঁথে যায়। একবার অশ্লীল দৃশ্য চোখে পড়লে, সে দৃশ্য বারবার মনে ফিরে আসে, কল্পনায় বাসা বাঁধে, এবং একসময় হাত-পা সে অনুসারে চলতে শুরু করে।

- আল্লাহ বলেন: "মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্রতা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন।" সূরা নূর, ২৪:৩০
- ইমাম ইবনু কাইয়্যিম (রহ.) বলেন: "***দৃষ্টির পাপ হৃদয়ের জন্য বিষ।*** তা ঈমানের আলো নিভিয়ে দেয়। চোখের গুনাহ কখনো একা আসে না, বরং সে হাতে ধরে আরও অনেক পাপ নিয়ে আসে।"- ইগাসাতুল লাহফান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৫

- **চোখের প্রতিটি অবৈধ দৃষ্টি অন্তরে একটি কালো দাগ ফেলে।** এসব দাগ জমে জমে হৃদয়ের আলো নষ্ট করে দেয়। তখন কুরআনের আয়াত হৃদয় ছুঁয়ে না, নামাজে কান্না আসে না, সেজদায় শীতলতা অনুভূত হয় না। চোখের হেফাজতের ব্যর্থতা সবচেয়ে গভীর ক্ষতি করে নিঃশব্দে।
- **চোখ হলো হৃদয়ের দরজা।** যে চোখ অশ্লীল দৃশ্য দেখে, সে শুধু একটি মুহূর্তের তৃপ্তি খোঁজে না-সে একটি দীর্ঘস্থায়ী আসক্তি তৈরি করে। এক নজর হয়তো তেমন কিছু নয়, কিন্তু সেই এক নজর প্রতিদিনকার অভ্যাসে পরিণত হয়, একসময় তা চরিত্রের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। চোখের এই অবাধ দৃষ্টি অন্তরে নোংরা চিত্র আঁকে, যেগুলো ধুয়ে ফেলা কঠিন হয়ে যায়। আর এই চিত্র থেকে জন্ম নেয় কল্পনার অপবিত্র জগত, যা বাস্তব জীবনের সম্পর্কগুলোকেও বিষিয়ে তোলে। চোখের এই অপব্যবহার একসময় মানুষকে গভীর পাপের দিকে ঠেলে দেয়, সে কখনও জেনে-শুনে, কখনও না জেনেই।

এই তিনটি-অশ্লীলতা, গান-বাজনা ও চোখের অবাধ দৃষ্টি-সবই একই পথে পরিচালিত করে, যেখানে মানুষ প্রথমে নিজের পবিত্রতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, তারপর নিজের আত্মিক ভারসাম্য হারায়, এবং একসময় নৈতিক অধঃপতনের গভীর খাদে পতিত হয়। এগুলোকে ছোট করে দেখা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর, কারণ এগুলো মানুষকে তার আসল সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ইসলামের এই বিষয়ে কড়া অবস্থান কোনো শাসন নয়, বরং হৃদয়ের সেই সূক্ষ্মত্ব রক্ষার জন্য এক নিবিড় যত্ন।

৪.১২ দোয়া ও জিকিরের অবহেলার কুফল

১. আত্মার মৃত্যু ও অন্তরের অন্ধত্ব: যে ব্যক্তি দোয়া ও জিকির থেকে গাফেল থাকে, তার হৃদয় আল্লাহর নূর থেকে বঞ্চিত হয়। দোয়া হলো বান্দার আল্লাহর সঙ্গে সংলাপ, আর জিকির হলো অন্তরের আলো। এ দুই থেকে বিমুখ হওয়া মানে নিজের আত্মাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া। আল্লাহ বলেন:"أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" "নিশ্চয়ই আল্লাহর জিকিরেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।"-(সূরা রা'দ, ১৩:২৮)এই প্রশান্তি ছাড়া জীবন হয় অন্তঃসারশূন্য। গাফেল অন্তর হয় পাথরের মতো কঠিন। রাসূল (সা.) বলেছেন:"জিকিরহীন অন্তর মৃত অন্তরের মতো।" - (মুসনাদে আহমদ)

২. শয়তানের দখলে পড়ে যাওয়া: যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ ত্যাগ করে, তার ওপর শয়তান সহজেই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সে তখন অজান্তেই শয়তানের নির্দেশনায় চলে। তার চিন্তা, কর্ম,

এবং জীবনের অভিমুখ হয়ে যায় দুনিয়ার দিকে ঝুঁকেপড়া ও আখিরাতের বিস্মৃতি। আল্লাহ বলেন:"ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانًا فهو له قرين" "যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, আমরা তার জন্য এক শয়তান নিযুক্ত করি, সে তার সঙ্গী হয়ে যায়।" - (সূরা যুখরুফ, ৪৩:৩৬) ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন: "যখন বান্দা জিকির ছেড়ে দেয়, শয়তান তার হৃদয়ে বিষ ঢেলে দেয়। - (আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যিব)

৩. আল্লাহর রহমত ও সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হওয়া: জিকিরকারী আল্লাহর নিকটবর্তী হয়। আর গাফেল বান্দা ধীরে ধীরে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "فاذكروني أذكركم" 'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করবো।" (সূরা বাকারা, ২:১৫২) যে আল্লাহকে স্মরণ করে না, আল্লাহও তাকে বিস্মৃত করেন। এটি নিছক অবহেলা নয়, বরং এক মহা বিপদ।

৪. ইমান দুর্বল হয়ে পড়া ও আমল থেকে বিমুখতা: দোয়া ও জিকির হলো ইমানের জ্বালানি। এগুলো ছাড়া ইমান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানুষ ধীরে ধীরে আল্লাহর বিধান থেকে বিমুখ হতে থাকে। নামাজ, রোজা, হালাল-হারামের পার্থক্য-সবই একসময় গৌণ হয়ে যায়। ইমাম গাযযালী বলেন:"যে জিকিরে অভ্যস্ত নয়, সে ইবাদতের মাধুর্য কখনো উপলব্ধি করতে পারে না।"-(ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন)

৫. হাশরের দিন লজ্জা ও আফসোস: কিয়ামতের দিনে এমন বহু মুহূর্ত আসবে, যখন বান্দা দোয়া ও জিকিরহীনতার জন্য নিজেই নিজের প্রতি অভিসম্পাত করবে। তখন তার মুখে দোয়া থাকবে না, অন্তরে আলো থাকবে না, জিহ্বা থাকবে না আল্লাহর স্মরণে অভ্যস্ত। রাসূল (সা.) বলেন: "সাত শ্রেণির মানুষ কিয়ামতের দিনে আল্লাহর আরশের ছায়ায় থাকবে... এর একজন সেই ব্যক্তি, যার চোখ একাকী আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে।"- (বুখারী ও মুসলিম) এ সম্মান থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে এক চিরন্তন আফসোস বয়ে বেড়ানো।

৬. দুনিয়ার অশান্তি ও মানসিক অস্থিরতা: আধুনিক যুগে যেভাবে মানসিক উদ্বেগ, হতাশা ও আত্মহননের প্রবণতা বেড়েছে, তার পেছনে অন্যতম কারণ হলো আত্মার ক্ষুধা-যা শুধু আল্লাহর স্মরণেই প্রশান্ত হয়। ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন: 'জিকিরহীন জীবন একটি যন্ত্রণা, যা মানুষকে মরণকেও কামনা করতে বাধ্য করে।" দোয়া ও জিকির আত্মার ওষুধ, আর তা না থাকলে আত্মা কষ্টে ছটফট করে-কিন্তু মানুষ তা বুঝতে পারে না।

দোয়া ও জিকিরের অবহেলা যেন এক বিষাক্ত নীরবতা-যা আত্মাকে নিঃশেষ করে দেয়। এটি এমন এক অভ্যাস, যার অনুপস্থিতি ধীরে ধীরে মুমিনকে নিঃস্ব করে তোলে, যেন বাতাসহীন ঘরে প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

অধ্যায় ৫: আমলি অধঃপতনের প্রভাব

আমলি অধঃপতন বা ধর্মীয় জীবনাচরণের অবহেলা শুধু ব্যক্তির নয়, পুরো পরিবার এবং সমাজের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, সঠিক আমল এবং ঈমান একমাত্র মানব জীবনের শান্তি ও উন্নতির ভিত্তি। যখন ব্যক্তি তার আমলে অবহেলা করে, তখন তা তার ব্যক্তিগত জীবনে আত্মিক অস্থিরতা, হতাশা এবং রিজিক সংকট সৃষ্টি করে। গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা এবং হিদায়াত থেকে বিচ্যুতি তাকে ঈমানের পথ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

পারিবারিক জীবনেও আমলি অধঃপতনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কলহ, অশান্তি, এবং রহমতের অভাব বাড়তে থাকে। সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা থেকে দূরে রাখা এবং পরিবারের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব স্বাভাবিকভাবেই পারিবারিক শান্তি এবং সুখের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়া, সমাজে আমলি অধঃপতন এক অনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে, যেখানে অশ্লীলতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং নৈতিক অবক্ষয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সমাজের ধর্মীয় মূল্যবোধের পতন সমাজের সার্বিক উন্নতির পথে একটি বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

৫.১ ব্যক্তিগত জীবনে আমলি অধঃপতনের প্রভাব

আমল হলো মু'মিন জীবনের প্রাণশক্তি। ইবাদত, জিকির, তিলাওয়াত, দোয়া-এসব হৃদয়ের বাতি। এই বাতি নিভে গেলে অন্তর ঢেকে যায় অন্ধকারে, আর সেই অন্ধকারে জন্ম নেয় পাপ, পেরেশানি, রিজিকে অনাবৃততা ও আত্মিক শূন্যতা। আমলি অধঃপতনের ফলে একজন মানুষ কেবল আল্লাহর স্মরণ থেকেই বিচ্যুত হয় না, বরং ধীরে ধীরে সে পথ হারায়, পরিণামে তার ব্যক্তিজীবন হয় বিশৃঙ্খল, অবর্ণনীয় কষ্টে ভরা। এ প্রভাব বিভিন্ন দিক থেকে আলোচ্য-

১. আত্মিক অস্থিরতা ও অন্তরের অশান্তি: যে অন্তর আল্লাহর জিকিরে সিক্ত থাকে, সেখানে প্রশান্তির ধারা প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে, সেখানে বাসা বাঁধে ভয়, অস্থিরতা ও অন্তর্জ্বালা। আল্লাহ তাআলা বলেন: أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب অর্থ: "জেনে রেখো! নিশ্চয়ই আল্লাহর জিকিরেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।"(সূরা রা'দ, আয়াত ২৮) যখন একজন মুমিন ইবাদতকে অবহেলা করে, তখন তার হৃদয়ে উদ্বেগ ও অশান্তি জন্ম নেয়, সে অনুভব করে একধরনের মানসিক খরা-যা কেবল আত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমেই উপশম

সম্ভব। আত্মা আল্লাহর দিকে ফিরে না গেলে সে দিকভ্রান্ত হয়-এই দিকভ্রান্তিই হলো আত্মিক অস্থিরতার মূল কারণ।

২. রিজিকে সংকট ও বরকতের অপসারণ: আমল ও তাকওয়া মানুষের জীবনে বরকতের চাবিকাঠি। ইবাদত পরিত্যাগ করলেই রিজিকে সংকুচিততা দেখা দেয়, আর যেটুকু আসে তাতেও থাকে না তৃপ্তি বা কল্যাণ। আল্লাহ তাআলা বলেন: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا অর্থ: "আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জীবিকা হবে সংকুচিত।" (সূরা ত্বাহা, আয়াত ১২৪)। রিজিকের পরিমাণ নয়, বরং বরকতই তার প্রকৃত স্বাদ। পাপ ও ইবাদতের অবহেলা সেই বরকতের গলাটিপে ধরে। একজন ব্যক্তি হয়তো অনেক উপার্জন করে, কিন্তু তার অন্তরে সন্তুষ্টি থাকে না, কারণ রুহানিয়াতের দরজা সে নিজেই বন্ধ করে দিয়েছে।

৩. হতাশা ও মানসিক বিপর্যয়: যখন অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে চলে যায়, তখন সে অন্তর হয় দুর্বল, অন্ধ ও আত্মবিশ্বাসহীন। জীবনের যেকোনো পরীক্ষায় সে তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ে। হাদীস শরীফে নবী (সা.) বলেন: تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ অর্থ: "তুমি সুখে থাকাকালে আল্লাহকে চিন, তাহলে দুঃখে আল্লাহ তোমাকে চিনবেন।" (তিরমিযি, হাদীস ২৫১৬) যে ব্যক্তি সুখে ইবাদত পরিত্যাগ করে, সে দুঃখে ডুবে যায় শূন্যতায়। মনস্তাত্ত্বিকভাবে সে বেঁচে থাকলেও আত্মিকভাবে সে নিঃস্ব হয়। তার চিন্তা-ভাবনা হয়ে পড়ে নেতিবাচক, যা তাকে আত্মবিধ্বংসী পথে ধাবিত করে।

৪. গুনাহে অভ্যস্ততা ও হিদায়াত থেকে বিচ্যুতি: ইবাদতের অনুপস্থিতিতে অন্তর হয়ে পড়ে নির্জীব, নিষ্প্রভ। তখন তা পাপকে পাপ বলে মনে করে না, বরং গুনাহে লিপ্ত হওয়াকেই আনন্দের উপায় মনে করে। আল্লাহ বলেন:كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ অর্থ: "না, বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে মরিচার সৃষ্টি করেছে।"(সূরা মুত্তাফফিফীন, আয়াত ১৪) গুনাহ করতে করতে অন্তর মোহরাবদ্ধ হয়ে যায়। তখন হিদায়াত আর তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। সে ইচ্ছা করলেও আমলের পথে ফিরতে পারে না-এ এক হৃদয়বিদারক বিপদ।

৫. অলসতা ও আমলের প্রতি নিস্পৃহতা: ইবাদত পরিত্যাগ অলসতা জন্ম দেয়। নামাজকে ভার মনে হয়, দোয়ার সময় থাকে না, কুরআন খোলার আগ্রহও আসে না। এরকম মানসিকতা নিছক দৈহিক ক্লান্তি নয়-এ একটি ঈমানি দুর্বলতা। মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) বলেন: "মানুষ যদি আমলের সুতা ছিঁড়ে ফেলে, তবে সে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কহীন এক পাপমগ্ন জীবনে পতিত হয়।" (তাফহীমুল কুরআন)

ইবাদতের প্রতি অনাগ্রহ ধীরে ধীরে একজন মানুষকে মুনাফেকির পথে ঠেলে দেয়। একসময় সে কেবল মুখে মুসলিম থাকে, অন্তরে নয়।

এই বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট যে, আমলি অধঃপতনের ফল শুধু দুনিয়ার ব্যর্থতা নয়, বরং আখিরাতেরও ভয়াবহ পরিণতির সূচনা। তাই আত্মাকে জাগ্রত রাখতে, অন্তরকে আলোকিত রাখতে, এবং রিজিক, প্রশান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে হলে-আমলেই ফিরতে হবে, ইবাদতের আঁচলেই আশ্রয় নিতে হবে।

৫.২ পারিবারিক জীবনে আমলি অধঃপতনের প্রভাব

পরিবার হলো সমাজের মৌলিক একক এবং শান্তির একমাত্র আশ্রয়স্থল। আর এই শান্তি তখনই সম্ভব, যখন পরিবারের প্রতিটি সদস্য আমলদার, আল্লাহভীরু এবং দ্বীনদার। আমল পরিত্যাগ বা আমলি অধঃপতনের ফলে পারিবারিক জীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসে তা কেবল বাহ্যিক নয়, বরং তা আত্মিক, মানসিক ও নৈতিক জগৎকে ভেঙে দেয়।

১. কলহ, অশান্তি ও রহমতের অভাব: যে পরিবারে ইবাদত নেই, নামাজ নেই, সেখানে আল্লাহর রহমতও থাকে না। বরং শয়তান সেই ঘরে বাস করে, আর সেখানে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব, কলহ ও মনোমালিন্যের আগুন জ্বলতে থাকে।রাসূল (সা.) বলেন:
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ
অর্থ: "যখন কেউ ঘরে প্রবেশ করে ও খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান বলে, 'আজ রাতে তোমাদের এখানে থাকার কোনো জায়গা নেই, খাবারও নেই।'
(সহিহ মুসলিম, হাদীস ২০১৮) অর্থাৎ, আল্লাহর জিকির আর ইবাদতই হলো পারিবারিক শান্তির চাবিকাঠি। আমল থেকে সরে গেলে, ঘর হয়ে ওঠে কলহের ক্ষেত্র, কারণ তখন সেখানে আল্লাহর বদলে শয়তানের দখলদারিত্ব ঘটে।
২. পারস্পরিক ভালোবাসার বিলুপ্তি: আমলহীনতা আত্মাকে কঠিন করে তোলে, হৃদয়ে রুহানিয়াত থাকে না, ফলে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন-সব সম্পর্কের মাঝে ভালোবাসার বদলে অবজ্ঞা, অবিশ্বাস ও অহংকার প্রবেশ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا অর্থ: "যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, দয়াময় তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন।" (সূরা মারইয়াম, আয়াত ৯৬) যদি আমল না থাকে, তবে সেই ভালোবাসা রহস্যজনকভাবে হ্রাস পায়, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, সম্পর্ক হয়ে পড়ে স্বার্থান্বেষী এবং ঠুনকো।

৩. সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া: যদি পিতা-মাতা নিজেরাই আমলি না হন, তাহলে সন্তানেরা কিভাবে দ্বীনের শিক্ষা পাবে? এমন পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশুদের জীবনে কুরআন, নামাজ বা হালাল-হারামের সংজ্ঞাই থাকে না। ফলস্বরূপ, তারা গড়ে ওঠে ধর্ম-সচেতনতা থেকে বিছিন্ন এক প্রজন্ম হিসেবে। আল্লাহ বলেন: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো।" (সূরা তাহরীম, আয়াত ৬) এখানে 'আহল' বলতে স্ত্রী-সন্তানকে বোঝানো হয়েছে। আমলের মাধ্যমে সন্তানদের দ্বীন শেখানোই হলো পিতামাতার দায়িত্ব। অথচ আমলি অধঃপতনের ফলে এই দায়িত্ব উপেক্ষিত হয়, ফলে সমাজে এক অপদার্থ ও ভ্রান্তচিন্তাধারার প্রজন্ম গড়ে ওঠে।

৪. দুআ ও বরকতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া: যখন কোনো ঘরে ইবাদত হয় না, কুরআন তিলাওয়াত হয় না, দুআ করা হয় না-তখন সে ঘর কেবলই দেয়ালঘেরা একটি কাঠামো হয়ে দাঁড়ায়, যার ভেতরে বরকত নেই, প্রশান্তি নেই। ইমাম ইবনে কায়্যিম (রহ.) বলেন:
"যে ঘরে কুরআনের তিলাওয়াত হয় না, যে পরিবারে আল্লাহর স্মরণ থাকে না, সে ঘরে বরকত নামে না, বরং সেখানে নেমে আসে মুসিবত।" (আল-ওয়াবিলুস সাইয়্যিব)
রাসূল (সা.) বলেন:اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا অর্থ: "তোমাদের নামাযের কিছু অংশ ঘরে পড়ো, ঘরকে কবর বানিয়ে ফেলো না।" (সহিহ বুখারী, হাদীস ৪৩২) নামাযবিহীন ঘর কবরের মত নিষ্প্রাণ। আমল পরিত্যাগের ফলে ঐ ঘর আলোর পরিবর্তে ঘুটঘুটে অন্ধকারে পরিণত হয়, যার প্রভাব পড়ে প্রতিটি সদস্যের জীবনে।

৫.৩ সামাজিক জীবনে প্রভাব

একটি সমাজ তখনই সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়, যখন তার ভিত্তি গঠিত হয় তাকওয়া, ন্যায়ের উপর এবং যেখানে আল্লাহভীতি ও হেদায়াতের আলো সমাজজীবনের প্রতিটি কোণে জ্বলে। কিন্তু যখন সমাজের সদস্যরা আমল থেকে বিচ্যুত হয়, তখন তা একটি মরুভূমিতে পরিণত হয়-যেখানে মানুষ থাকে, সভ্যতা থাকে, কিন্তু আত্মা থাকে মৃত, নীতি থাকে মলিন। এমন সমাজে জন্ম নেয় অশ্লীলতা, অপরাধ, ভ্রষ্টাচার এবং সর্বোপরি, এক ভয়াবহ নৈতিক দেউলিয়াপনা।

১. অশ্লীলতার প্রসার ও নিরাপত্তাহীনতা: আমলহীনতার প্রথম ভয়াবহ কুফল হলো-অশ্লীলতার বন্যা। যখন নামাযের আলো নিভে যায়, তখন চোখ বেপরোয়া হয়, মুখ দুর্বিনীত হয়, আর নফসের পশুত্ব সমাজজুড়ে বিজয় উল্লাস করে। ফলে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে নগ্নতা, ব্যভিচার,

ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, শিশু নিপীড়ন ইত্যাদি ভয়ঙ্কর অপরাধ। এইসব কুকর্ম সমাজ থেকে শান্তি কেড়ে নেয়, সৃষ্টি করে নিরাপত্তাহীনতা।

- আল্লাহ বলেন:وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا অর্থ"ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না। নিঃসন্দেহে এটি অশ্লীল কাজ এবং এক নিকৃষ্টতম পথ।" সূরা ইসরা: আয়াত ৩২

এই আয়াতের শব্দচয়নই প্রমাণ করে যে, ইসলাম শুধু গোনাহকে হারাম করেনি-বরং গোনাহের পথ ও সম্ভাবনাকেও রুদ্ধ করেছে। আল্লাহ ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন, কারণ এই পথের সূচনা হয় চাহনি, কথাবার্তা, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার মাধ্যমে।

- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "যখন তুমি লজ্জা হারিয়ে ফেলবে, তখন যা ইচ্ছা তাই করবে।" -(সহীহ বুখারী: হাদীস ৬১২০) তিনি আরো বলেন: "লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অঙ্গ।"- (সহীহ মুসলিম: হাদীস ৩৬) অতএব, আমলি অধঃপতন কেবল ব্যক্তির ক্ষতি করে না, বরং সমাজকে লজ্জাহীন, বেহায়া ও পশুর আস্তানায় পরিণত করে। মানুষ তখন পশুর মতো আচরণ করে কিন্তু মুখে সভ্যতার কথা বলে।

২. নৈতিক অবক্ষয় ও দ্বীনি মূল্যবোধের পতন: আল্লাহভীতি যখন অন্তর থেকে মুছে যায়, তখন মানুষ কেবল দুনিয়ার লোভে ছুটতে থাকে-সৎ-অসৎ, হালাল-হারাম, ইনসাফ-জুলুমের পার্থক্য ভুলে যায়। একসময় সে অন্যায়কে স্বাভাবিক, এবং গোনাহকে 'ব্যক্তিগত ব্যাপার' বলে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই অবস্থাকে বলা হয়-নৈতিক মৃত্যু।

- আল্লাহ বলেন:ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاس... অর্থ:"স্থলে ও জলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে মানুষের কৃতকর্মের কারণে..."এই আয়াত প্রমাণ করে যে মানুষের গোনাহ, অসৎ কর্ম, জুলুম-এসবের কারণে সমাজ শুধু নৈতিক নয়, প্রকৃতিগতভাবেও ধ্বংস হয়। ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, মহামারী-এসব অনেক সময় গোনাহের সামাজিক প্রতিক্রিয়া।
- রাসূল (সা.) বলেন:"তোমরা যদি অন্যায়কে প্রতিহত না করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের সবাইকে আযাবে গ্রেপ্তার করবেন।"- তিরমিযী: হাদীস ২১৬৮
- ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন: "যখন মানুষ আল্লাহর ইবাদতে অলস হয়, তখন শয়তান তার অন্তরে নাফরমানির বীজ বপন করে, যা থেকে সমাজে বিপর্যয় জন্ম নেয়।"- মাদারিজুস সালিকিন

আমলি অধঃপতনের সামাজিক ফলাফল হয় গভীর, ব্যথিত ও ধ্বংসাত্মক। এই পতন সমাজের আত্মাকে হত্যা করে, যেখানে মানুষ থাকে কিন্তু মানবতা থাকে না। একমাত্র আল্লাহর পথে ফিরে আসাই পারে এই অন্ধকার সমাজে ঈমানের আলো জ্বালাতে।

অধ্যায় ৬: আমলি অধঃপতন রোধে ব্যক্তিগত করণীয়

মানব জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য ও সফলতা নিহিত রয়েছে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ, তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা এবং নফস ও শয়তানের ধোঁকায় না পড়ে আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখার মধ্যে। কিন্তু যখন মানুষ আমলহীনতায় নিমজ্জিত হয়, তখন অন্তর কঠিন হয়ে যায়, গুনাহ তার রূহানিয়াতকে গ্রাস করে এবং ধীরে ধীরে সে হিদায়াতের আলো থেকে দূরে সরে যায়। এই আত্মিক অধঃপতন রোধে প্রয়োজন গভীর আত্মসমালোচনা, আন্তরিক তওবা, সৎ সঙ্গ এবং কুরআন-সুন্নাহর পথে দৃঢ় প্রত্যাবর্তন। কেননা **ব্যক্তি যদি নিজেই নিজেকে শোধরাতে সচেষ্ট না হয়, তবে সমাজ ও জাতির পুণরুদ্ধার কখনোই সম্ভব নয়**। এই অধ্যায়ে এমন কিছু করণীয় তুলে ধরা হলো, যা ব্যক্তিগতভাবে পালনের মাধ্যমে একজন মুমিন তার আমল সংরক্ষণ করতে পারে এবং নিজেকে হিদায়াতের সোপানে পুনরায় স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

৬.১ গুনাহ চিহ্নিতকরণ ও আন্তরিক তওবা

গুনাহ হচ্ছে আত্মার জন্য বিষতুল্য; এটি অন্তরকে অন্ধ করে দেয়, ঈমানকে দুর্বল করে এবং আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই আমলি অধঃপতন রোধে প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ হলো নিজের গুনাহসমূহ চিহ্নিত করা এবং আল্লাহর দরবারে আন্তরিক তওবা করা। গুনাহ চিহ্নিত না করলে তওবা সম্ভব নয়, আর তওবা ছাড়া আত্মশুদ্ধির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

- কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-"وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তওবা কর, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"(সূরা আন-নূর, আয়াত ৩১)
- আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন-"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন এবং যারা নিজেদের পবিত্র রাখে তাদেরও ভালোবাসেন।"(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২২২)
- হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-"كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون" অর্থ: "সকল আদম সন্তানেরাই গুনাহগার; আর সবার মধ্যে উত্তম হলো সেই ব্যক্তি, যে গুনাহ করে তওবা করে।"(জামি আত-তিরমিযি, হাদীস: ২৪৯৯)
- ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন: "তওবা হলো এমন এক দৃষ্টি, যা বান্দাকে গুনাহের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ফিরিয়ে আনে।".(ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, খণ্ড ৪)

আত্মার শুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য তওবা অপরিহার্য। তওবা শুধু মুখের কথা নয়- এর জন্য চাই অন্তরের অনুশোচনা, গুনাহ পরিহারের দৃঢ় সংকল্প এবং ভবিষ্যতে সে গুনাহে ফিরে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা। তওবা মানুষের রূহানিয়াতকে পুনরুজ্জীবিত করে, অন্তরে প্রশান্তি এনে দেয় এবং আমলকে পরিশুদ্ধ করে। এই আত্মিক জাগরণই আমলি অধঃপতনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ঢালস্বরূপ।

৬.২ দোয়া, ইস্তেগফার ও জিকিরে নিয়মিত থাকা

আমলি অধঃপতন রোধে অন্তরের শক্তি, ঈমানের পুষ্টি এবং আমলের দৃঢ়তা নিশ্চিত করতে হলে বান্দার আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া অপরিহার্য। আর সেই সম্পর্কের গভীরতম প্রকাশ ঘটে দোয়া, ইসতিগফার ও যিকিরে। এগুলো অন্তরকে জীবন্ত রাখে, পাপের ঘন অন্ধকার থেকে হৃদয়কে আলোর দিকে ফিরিয়ে আনে এবং আল্লাহর রহমত ও সাহায্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে।

- কুরআনের বর্ণনায়, "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ" অর্থ: “সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫২)
- আল্লাহ বলেন, "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" অর্থ: “আল্লাহ এমন নন যে, তুমি তাদের মধ্যে অবস্থান করলেও তিনি তাদের শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ এমনও নন যে, তারা ইস্তিগফার করতে থাকলেও তাদের শাস্তি দেবেন।” (সূরা আনফাল, আয়াত ৩৩)
- হাদীসের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-"مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ" অর্থ: “যে ব্যক্তি ইসতিগফারকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে, আল্লাহ তার সব চিন্তা-দুঃখের সমাধান করে দেন, সংকট থেকে উদ্ধার দেন এবং এমন জায়গা থেকে রিজিক দেন যেখান থেকে সে ধারণাও করতে পারে না।” (সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ১৫১৮)
- ইমাম নববী (রহ.) বলেন: “যিকির হলো অন্তরের জীবন, আর ইসতিগফার হলো আত্মার পরিচ্ছন্নতা।” (আল-আযকার)

আজকের যুগে যেখানে ফিতনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে দোয়া হলো বান্দার আত্মার প্রতিরক্ষা। ইসতিগফার অন্তরকে পাপের গন্ধ থেকে মুক্ত করে, যিকির অন্তরে ঈমানের আলো

জ্বালিয়ে রাখে। এগুলো নিয়মিত চর্চা করলে আমল শক্তিশালী হয়, অন্তর নরম হয়, এবং শয়তানের ধোঁকায় পড়ার সম্ভাবনা কমে যায়। যারা দোয়া ও যিকির থেকে গাফেল থাকে, তারা শয়তানের কৌশলে সহজেই ধরাশায়ী হয়।

৬.৩ ইলমে নাফী অর্জন ও দ্বীন শিখতে আগ্রহ

আল্লাহর নৈকট্য অর্জন এবং আমলি অধঃপতন থেকে আত্মাকে রক্ষা করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো- উপকারী জ্ঞান অর্জন ও দ্বীন শিখার জন্য আন্তরিক চেষ্টা। ইলমে নাফী তথা উপকারী জ্ঞান সেই আলো, যা মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে, সোজা পথ দেখায় এবং আমলের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।

- কুরআনের বর্ণনায়,"قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون"

অর্থ: বল, "যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?" (সূরা যুমার, আয়াত ৯)

- অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء"

অর্থ: "আল্লাহর প্রকৃত ভয় রাখে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী।" (সূরা ফাতির, আয়াত ২৮)

- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين"

অর্থ: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের ফিকহ (গভীর জ্ঞান) দান করেন।"(সহিহ বুখারি, হাদীস: ৭১)

- ইমাম ইবনু কাইয়্যিম (রহ.) বলেন: "ইলম ব্যতীত আমল অন্ধ, আর আমল ব্যতীত ইলম অপূর্ণ।" (মিফতাহু দারিসসা'দাহ)

ইলমে নাফী মানে কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, বরং এমন জ্ঞান যা অন্তরকে নরম করে, চোখে অশ্রু আনে, আত্মাকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়। যখন কেউ দ্বীন সম্পর্কে জানতে চায়, তখন সে তার ভ্রান্ত পথগুলোর পরিচয় পায় এবং নিজের ভুল শুধরে সঠিক পথে চলতে সক্ষম হয়। জ্ঞানের আলো ছাড়া আমলের স্থায়িত্ব হয় না, বরং মানুষ পাপকে পাপ বলেও চিনে না। এজন্য ইলম অর্জনের জন্য সময় নির্ধারণ, বই পড়া, আলেমদের সান্নিধ্য গ্রহণ এবং দরসে কুরআন ও হাদীসে উপস্থিত থাকা আমলি অধঃপতনের প্রতিষেধক।

৬.৪ সৎ সঙ্গ গ্রহণ ও খারাপ সঙ্গ পরিহার

সৎ সঙ্গ মানে- এমন মানুষের সান্নিধ্য গ্রহণ করা, যাদের কথাবার্তা, চালচলন ও জীবনধারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে এবং যারা আমল, আখলাক ও ঈমানকে উন্নত করতে সহায়ক। আর খারাপ সঙ্গ মানে- এমন পরিবেশ ও মানুষদের কাছাকাছি থাকা, যারা গুনাহকে সহজ করে তোলে, অন্তরকে গাফেল করে তোলে এবং আমলি অধঃপতনের দিকে ধাবিত করে।

আল্লাহর নৈকট্য পেতে এবং আমলি অধঃপতনের ক্ষতিকর স্রোত থেকে আত্মাকে রক্ষা করতে হলে- সৎ সঙ্গ বেছে নেওয়া ও খারাপ সঙ্গ পরিহার করাই অন্যতম করণীয়। মানুষের মন নরম, গ্রহণশীল ও প্রভাবিত হওয়ার যোগ্য। তাই সে যার সঙ্গ গ্রহণ করে, তার আচরণ ও চরিত্রের ছাপ নিজের মধ্যেও পড়ে।

- কুরআনের বর্ণনায় " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ"

অর্থ: “হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।”(সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১১৯) এই আয়াত সঙ্গ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়- সত্যনিষ্ঠ, দ্বীনদার ও আল্লাহভীরুদের সঙ্গ গ্রহণ করা মুমিনের কর্তব্য।

- হাদীসের বর্ণনায়: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-। " الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ" অর্থ: “একজন ব্যক্তি তার বন্ধুদের দ্বীন অনুযায়ী চলে; অতএব তোমাদের কেউ যেন দেখে নেয় সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে।” (তিরমিজি, হাদীস: ২৩৭৮) এ হাদীস মানবচরিত্র গঠনের একটি গভীর বাস্তবতা প্রকাশ করে- সঙ্গ মানুষকে গঠনও করতে পারে, আবার ধ্বংসও করতে পারে।
- আরেক হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন- “সৎ সঙ্গী হলো আতর বিক্রেতার মতো; যদি সে থেকে আতর না-ও পাও, তার সুন্দর ঘ্রাণে উপকৃত হবে। আর খারাপ সঙ্গী হলো কামারের মতো; সে তোমার পোশাকে আগুনের ছিটে ফেলবে কিংবা তার দুর্গন্ধে তুমি কষ্ট পাবে।” (বুখারি ও মুসলিম)
- ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন: “তুমি কার সঙ্গে বসো, তা দেখো- কারণ বন্ধু হল আয়নার মতো। সে তোমার দোষ-গুণ প্রকাশ করবে, তোমার অন্তরকেও প্রভাবিত করবে।”

বিশ্লেষণ

ক) সঙ্গী যেমন, অন্তর তেমন: মানুষের অন্তর এক ধরনের ময়দানের মতো, যেখানে যে বীজ বপন করা হয়, সেটাই গজিয়ে ওঠে। যদি সেখানে সৎ সঙ্গের বীজ রোপিত হয়- তাহলে সৎ চিন্তা, সৎ আমল, দীনদার ভাবনা জন্ম নেবে। কিন্তু যদি খারাপ সঙ্গের ছায়া পড়ে- তাহলে গাফেলি, পাপের সাহস এবং হৃদয়ের অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে।

খ) ডিজিটাল বন্ধুত্ব ও আমলের বিপদ: বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বন্ধুত্ব ও সঙ্গ গড়ে ওঠে, যা কখনও পরোক্ষভাবে আমলি অধঃপতনের পথ সুগম করে দেয়। তাই আমাদের উচিত হবে, এমন সঙ্গী নির্বাচন করা যারা কুরআন-হাদীস আলোচনা করে, গুনাহ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

গ) সৎ সঙ্গ: হৃদয়ের হিদায়াহ: সৎ সঙ্গীর সংস্পর্শে মানুষ নিজেকে বদলাতে চায়, আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে চায়। আর খারাপ সঙ্গের ছায়ায় মানুষের আমল শুকিয়ে যায়, অন্তর কঠিন হয়ে যায়। তাই আমলি অধঃপতন রোধে আত্মার চিকিৎসা হলো- সৎ বন্ধু, ভালো পরিবেশ, আল্লাহভীরু সাথি ও পরহেযগার মহলে অবস্থান করা।

৬.৫ আখিরাতকে স্মরণ ও তাকওয়া অর্জন

আখিরাত স্মরণ মানে হলো- মৃত্যুর পরের জীবন, কবর, হিসাব, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়গুলোর কথা নিয়মিত মনে রাখা। আর তাকওয়া অর্থ- আল্লাহভীতি ও সচেতনতা, যার প্রভাবে মানুষ গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ বেছে নেয়।

- কুরআনের বর্ণনায়, "وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ"

অর্থ: "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, তোমাদেরকে তাঁরই দিকে একদিন একত্র করা হবে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২০৩)

- আল্লাহ বলেন, " فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ"

অর্থ: "যে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেল এবং জান্নাতে প্রবেশ করল, সে-ই সফল। আর দুনিয়ার জীবন ধোঁকার বস্তু ছাড়া কিছু নয়।"(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫)

- হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ"

অর্থ: "তোমরা যেটি সমস্ত আনন্দ নষ্ট করে দেয়, অর্থাৎ মৃত্যু- তার স্মরণ অধিক করো।" ।(তিরমিজি, হাদীস: ২৩০৭)

- ইমাম হাসান আল-বাসরী (রহ.) বলেন, "যে ব্যক্তি বেশি বেশি আখিরাত স্মরণ করে, তার কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত হয়, আর তার আমল সুন্দর হয়।"(হিলইয়াতুল আওলিয়া)

বিশ্লেষণ

আখিরাতের স্মরণ হলো এক জাগরণ- যা দুনিয়ার মোহ ভেঙে দেয়, গুনাহর হাত থেকে অন্তরকে ফিরিয়ে আনে, আর আত্মাকে তৈরি করে দেয় চিরস্থায়ী জীবনের জন্য। মৃত্যু, কবর, কেয়ামত- এগুলো মনে থাকলে দুনিয়ার সুখ-ভোগ, গুনাহ আর অলসতা একদম তুচ্ছ হয়ে যায়। অন্তরে জন্ম নেয় ভয়, আর ভয় থেকেই আসে তাকওয়া।

তাকওয়া এমন এক অভ্যন্তরীণ রক্ষাকবচ, যা মানুষকে একা অবস্থায়ও গুনাহ থেকে দূরে রাখে। যখন কেউ জানে যে, প্রতিটি কাজের হিসাব একদিন দিতে হবে, তখন সে নিজেকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে। আখিরাতের স্মরণ তাকে করে দেয় সংযত, পরিপূর্ণ, ও আল্লাহভীরু- যার প্রভাব তার আমল, সম্পর্ক, ব্যবহার- সবখানেই প্রতিফলিত হয়। আখিরাতের ভাবনা ছাড়া জীবন কেবল দুনিয়ার খেল-তামাশায় আটকে পড়ে; কিন্তু তাকওয়া হৃদয়ে থাকলে সে জীবন হয় আত্মার মুক্তি ও চিরস্থায়ী সাফল্যের পথে এক অদৃশ্য দীপ্ত শিখা।

৬.৬ কুরআনের সঙ্গ গ্রহণ ও আমল

কুরআনের সঙ্গ গ্রহণ মানে হলো কুরআনকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করা এবং তার শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করা। আমল মানে কেবল কুরআনের আয়াত পড়া নয়, বরং তার সঠিক ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রতিটি কাজ করা, যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

কুরআনে আল্লাহ বলেন

- وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِيَتْلَوْهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مَكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا

অর্থ: "এটা এমন একটি কুরআন, যা আমরা ধাপে ধাপে মানুষদের উপর আবির্ভাব করেছি, যাতে তারা এটি সতর্কতার সাথে পাঠ করতে পারে।" (সূরা আল-ইসরা, আয়াত ১০৬)

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

অর্থ: "হে বিশ্বাসীরা! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানী হচ্ছে মানুষ ও পাথর।" (সূরা তাহরিম, আয়াত ৬)

হাদীসের আলোকে:

- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন- "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه" অর্থ: "তোমাদের মধ্যে সেরা সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে এবং অন্যদের শেখায়।" (সহিহ বুখারি, হাদীস: ৫০৩৭)
- রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন- "اَلْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ"

অর্থ: “কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষী হবে।”(সহিহ মুসলিম, হাদীস: ৮০৮)

বিশ্লেষণ

- **কুরআনের সঙ্গে আত্মিক বন্ধন:** কুরআনের সঙ্গ গ্রহণ অর্থাৎ কুরআনের আধ্যাত্মিক শক্তি ও নির্দেশনার সাথে নিজেদের জীবনকে একসূত্রে বাঁধা। কুরআন এমন একটি পবিত্র গ্রন্থ, যার মধ্যে রয়েছে জীবন পরিচালনার সর্বোত্তম পথনির্দেশনা। এটি মানুষকে শুধু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার উপায়ই বলে না, বরং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সব দিককে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি প্রদান করে।
- **জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা:**কুরআন যদি জীবনের পথপ্রদর্শক হয়, তবে সেই পথে চলা তথা কুরআনের প্রতি আসল আমলই হলো জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কুরআনের আয়াতগুলির উপর আমল করা, তার শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা, আল্লাহর রাহে জীবন গঠন করা-এগুলি একমাত্র সত্যিকার সাফল্যের পথ। কুরআনের প্রতি আস্থা রেখে, সেই আস্থাকে জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও কর্মে বাস্তবায়িত করতে পারলেই তা মানুষের জন্য আখিরাতে সফলতার কারণ হবে।
- **সফল জীবনের আসল পথ:** কুরআনের সঙ্গ গ্রহণ মানে শুধু কুরআন পড়া নয়, বরং তার উপলব্ধি, তার গভীরতা এবং তার অনুসরণ করা, যাতে আমরা প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী করতে পারি। কুরআনকে জীবনে বাস্তবায়ন করতে হলে তার শিক্ষা অনুসরণ করা জরুরি, কারণ কুরআন শুধু পৃথিবীতে মানুষের জন্য পথ নির্দেশ করে না, বরং আখিরাতেও তাদের নাজাতের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায়।
- **শুধু পাঠ নয়, বাস্তবায়নই মূল আমল:** কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তার প্রতি আমল করার মাধ্যমে মানুষের জীবন হয়ে ওঠে সুমধুর, শান্তিপূর্ণ এবং সফল। একমাত্র কুরআনের সঙ্গই জীবনকে আলোকিত করে এবং আখিরাতের সফলতা নিশ্চিত করে।
- **কুরআন হলো জীবনের নূর:** কোরআন এমন এক নূর, যা অন্ধকারে পথ দেখায়, ডুবে যাওয়া হৃদয়ে আশা জাগায়। এটা শুধু ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং জীবনের প্রতিটি প্রশ্নের আলোকিত উত্তর। একজন সাধারণ মানুষ যখন কুরআনের আয়াতগুলো হৃদয় দিয়ে পড়ে, তখন সে দেখে-কোনটি ভুল, কোনটি সঠিক, কোন পথে শান্তি। এইভাবেই কোরআন হয়ে ওঠে তার জীবনের চিরন্তন নূর।

৬.৭ সালাতে খুশু ও স্থায়িত্ব

সংজ্ঞা: সালাতে খুশু মানে-আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও বিনয় সহকারে নামাজ পড়া। আর স্থায়িত্ব মানে-নিয়মিত ও কখনো না ছেড়ে সালাত আদায় করা। এই দুইটি মিলেই সালাত হয় প্রাণবন্ত, হৃদয়স্পর্শী ও আত্মা শুদ্ধকারী।

- **সালাতের প্রাণ খুশু:** সালাত এমন এক ইবাদত-যার মাধ্যমে বান্দা প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহর দরবারে দাঁড়ায়, মাথা ঝুকায়, চোখে অশ্রু আনে। কিন্তু এই সালাত যদি হয় মনোযোগহীন, খুশুহীন-তবে তা হয় নিঃপ্রাণ শরীরের অনুশীলন মাত্র। পক্ষান্তরে, খুশু ভরা সালাত মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে, তাকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে, আত্মাকে আলোকিত করে।
- **উদাহরণ :**এক যুবক নামাজে দাঁড়ায় ঠিকই, কিন্তু তার হৃদয় মোবাইলের নোটিফিকেশন আর ব্যবসার লাভ-লোকসানের হিসাবেই বিভোর। তার দেহ সেজদায় হলেও আত্মা যেন বাইরে ঘুরে বেড়ায়। এমন নামাজ দোয়ার দরজা খুলে না। আবার এক বৃদ্ধা নারী, অশ্রুসিক্ত চোখে সেজদায় পড়ে কাঁদে-"হে আল্লাহ, আমি শুধু তোমাকেই চাই" তাঁর এই সালাত হয় আত্মার ওষুধ।
- **গুনাহ রোধে খুশু:** খুশু ও স্থায়িত্বের সালাত মানুষের জীবনে অনেক পরিবর্তন আনে। এটি গুনাহের প্রতিবন্ধক দেয়াল তৈরি করে, কুপ্রবৃত্তির আগুন নেভায়। কারণ, যিনি খুশু নিয়ে সালাত পড়েন, তিনি সর্বদা সচেতন থাকেন-"আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছি।" তখন মিথ্যা, প্রতারণা, অশ্লীলতা, অহংকার-এসব তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" - সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:"তোমরা এমনভাবে সালাত আদায় করো, যেমনভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছো।" - (বুখারি)
- **সালাতহীন জীবন-আলোকহীন এক যাত্রা:** এই জন্যই আমলি অধঃপতন থেকে বাঁচতে সালাতকে শুধু অভ্যাস না বানিয়ে হৃদয়ের স্পন্দন বানাতে হবে। খুশু ছাড়া সালাত যেমন আত্মাহীন দেহ, তেমনি সালাতহীন জীবন এক আলোকহীন পথ। যে মুমিন হৃদয়ে খুশু নিয়ে সালাত আদায় করে, তার জীবনেই কুরআনের আলো, আখিরাতের আশা, দুনিয়ার শান্তি ও আল্লাহর সান্নিধ্য জেগে ওঠে।

৬.৮ তাকওয়া অর্জন

সংজ্ঞা: তাকওয়া মানে-আল্লাহকে সবসময় মনে রেখে জীবন যাপন করা। এমন জীবন, যেখানে প্রতিটি চিন্তা, কথা ও কাজের পেছনে থাকে একটাই প্রশ্ন:“**এটা করলে কি আমার রব খুশি হবেন?”** তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর ভয় এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা থেকে গুনাহ থেকে নিজেকে দূরে রাখা। এই ভয় দুনিয়ার শাস্তির ভয় নয়, বরং সেই ভয়-যা আসে তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য, তাঁর সান্নিধ্য না পাওয়ার চিন্তা থেকে।

গোপনেও যার ভয় জাগে: তাকওয়া এমন একটি মানসিক অবস্থা, যা একবার অন্তরে গেঁথে গেলে মানুষ আর আগের মতো থাকতে পারে না। সে চিন্তা করে, "মানুষ না জানলেও, আমার রব তো জানেন!" এই অনুভূতিই মানুষকে গোপনেও পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, নির্জনতায়ও আমলে স্থির রাখে।

আল-কুরআনের আলোকে তাকওয়া:

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।” (সূরা আহযাব: ৭০)
- إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم “তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান সে-যে সর্বাধিক তাকওয়াবান।” (সূরা হুজুরাত: ১৩)
- وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب “যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন এবং অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে রিজিক দেন।” (সূরা ত্বালাক: ২-৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী:

- " اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْت "

“তুমি যেখানে থাকো না কেন, আল্লাহকে ভয় করো।” (তিরমিজি, হাদীস: ১৯৮৭)

- “আল্লাহর ভয় করো, কারণ সেটাই সকল ভাল কাজের মূল।”

(সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদীস: ৭২৪)

উদাহরণ: একজন সৎ দোকানদার, যার মাপে একটু কম দিলে লাভ বেশি হয়, কিন্তু সে ভাবে- “মানুষ না দেখলেও, আমার রব দেখছেন।” তাই সে মাপে কম দেয় না, বরং নিজের ক্ষতি হলেও সঠিকভাবে মাপে। এই ভয়ের নাম তাকওয়া।

তাকওয়ার আলোয় আলোকিত জীবন: তাকওয়া মানুষকে মাটির কাছাকাছি রাখে, কিন্তু আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেয়। এটা এমন এক আলো, যা মানুষকে অন্ধকার থেকে টেনে তোলে, হৃদয়কে নরম করে, চোখে জল আনে। তাকওয়া থাকলে মানুষ একা থাকলেও গুনাহ করতে পারে না, দুনিয়ার সব সুযোগ থেকেও নাফরমানি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে-শুধু একটিই কারণে: "আল্লাহ আমাকে দেখছেন।" তাকওয়ার এই আলোই দুনিয়ায় নাজাতের পথ এবং আখেরাতে জান্নাতের চাবি।

৬.৯ গান-বাজনা ও হারাম বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকা

সংজ্ঞা: গান হলো সুরের সাথে উচ্চারিত মনোরঞ্জনমূলক কথা, যা অনেক সময় মনকে উত্তেজিত করে ও পাপের দিকে আহ্বান করে।

বাজনা হলো বাদ্যযন্ত্র দিয়ে তৈরি করা ছন্দ ও সুর, যা ইন্দ্রিয়কে আকৃষ্ট করে।

"হারাম" শব্দের অর্থ-যা আল্লাহ পাক কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং তা করলে গোনাহ হয়।

গান-বাজনার ক্ষতিকর প্রভাব: ইসলামে গান ও বাজনা হারাম,কেননা তা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয়, শরীরকে পাপের দিকে ঠেলে দেয়, বা মনে অশ্লীল চিন্তা সৃষ্টি করে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ গানই প্রেম-ভালোবাসা, অবাধ সম্পর্ক, নারীর শরীরচর্চা বা দুনিয়াবি মোহে ভরপুর। এর ফলে মানুষের হৃদয় নরম হওয়ার বদলে কঠোর হয়, সালাতে মন বসে না, চোখে অশ্রু আসে না, বরং গুনাহকে গুনাহ বলে মনে হয় না।

কুরআন ও হাদীসে নিষেধাজ্ঞা:

- আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله"

"মানুষের কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবান্তর কথা (গান) ক্রয় করে যেন তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে গোমরাহ করতে পারে।" -সূরা লুকমান, আয়াত ৬

- রাসূল (সা.) বলেন:

"আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক এমন আসবে যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।" -সহিহ বুখারী, হাদীস: ৫৫৯০

উদাহরণ:

১. একজন যুবক, যে নামাযে মনোযোগ দিতে পারে না, কারণ তার কানে সারাক্ষণ গান বাজে।

২. একটি মেয়ে, যে ভালো হিজাব করত, কিন্তু সিনেমার গান শুনে ধীরে ধীরে সাজগোজ ও দুনিয়াবি চাহিদায় ঝুঁকে পড়ল।

৩. এক পরিবার, যেখানে সারা দিন টিভিতে গান চলে-তাদের ঘরে কুরআনের তিলাওয়াতের বরকত হারিয়ে যায়।

বিশ্লেষণ

- **আত্মার অন্ধকারে সুর:** গান-বাজনা আত্মাকে অসাড় করে দেয়, আল্লাহর ভালোবাসা থেকে দূরে করে এবং গুনাহের রাস্তা মসৃণ করে তোলে। যে আত্মা আল্লাহর জিকিরে প্রাণ পায়, তার কাছে এসব সুর এক বিষাক্ত ফাঁদ।
- **পথে ফিরতে হলে সুর থেকে মুক্তি:** আল্লাহর পথে চলতে চাইলে, আত্মার পরিশুদ্ধি চাইলে-গান ও বাজনার ফাঁদ থেকে মুক্ত থাকা অপরিহার্য। তা না হলে, মানুষ কখনো কুরআনের মিষ্টতা, সালাতের প্রশান্তি, আর ইমানের শান্তি উপভোগ করতে পারবে না।
- **সুরের আবেগ বনাম আত্মিক শুদ্ধতা:** গান এবং বাজনা এমন এক শক্তিশালী মাধ্যম যা মানুষের মনের অঙ্গনে গভীর প্রভাব ফেলে। সুর ও শব্দের মাধুর্য মানুষের আবেগ এবং অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, তবে, যখন গান বা বাজনা অশ্লীলতা বা নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে পরিচালিত করে, তখন এটি একটি নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। বিশেষ করে যদি গান এমন কোন বিষয়কে উৎসাহিত করে যা মানুষের মনোযোগকে ভুল দিকে নিয়ে যায়, বা তাদের চরিত্রের বিকৃতি ঘটায়, তাহলে তা মূলত অকার্যকর ও নৈতিকভাবে ক্ষতিকর হতে পারে।
- **চিন্তায় বিষাক্ততার ছাপ:** একটি গান যদি মানুষের চিন্তা ও মনোভাবকে পবিত্রতার থেকে দূরে নিয়ে যায়, তাদের মনোযোগে অশ্লীলতা বা মন্দ প্রভাব ফেলে, তখন তা ওই ব্যক্তির জন্য একটি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এতে করে তার আত্মিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয় এবং সুন্দর, সত্য ও সৎ চিন্তা করতে সক্ষম হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।
- **শিশুমনে সুরের ছাপ:** ছোট শিশুরা যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, সেখানে গান ও বাজনার মাধ্যমে ভুল ধারণার প্রতিফলন ঘটলে, তাদের চরিত্র ও মানসিকতা দীর্ঘমেয়াদে প্রভাবিত হয়। তাই, যেখানে মানুষের মনোভাব, চিন্তা এবং বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে এমন কিছুর সাথে যুক্ত হয়, সেখানে গভীরভাবে সতর্ক থাকা উচিত।

গান-বাজনা হারাম হওয়ার কারণসমূহ :

১. আল্লাহর স্মরণের ব্যাঘাত: গান ও বাজনা মানুষের মনকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে নিয়ে যায়। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, "যারা আল্লাহর স্মরণে মনোনিবেশ করে না, তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে যায়" (সূরা আজ-যুমার, আয়াত ২২)। গান-বাজনা মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করে, ফলে প্রার্থনা ও আল্লাহর প্রতি নিবেদন কমে যায়।

২. অশ্লীলতা ও পাপের দিকে প্ররোচনা: অনেক গান ও বাজনা অশ্লীল ভাষা, সঙ্গীত এবং ভঙ্গি নিয়ে আসে, যা শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার পরিপন্থী। এগুলি মনুষ্যত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং পাপ ও অশ্লীলতা বৃদ্ধি পায়।

৩.সময়ের অপচয়: গান-বাজনা শখের মতো শোনা বা বাজানো সময়ের অপচয় হতে পারে, যা মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখে। ইসলামে সময়ের মূল্য অনেক বড়, এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

৪. মানসিক ও আত্মিক ক্ষতি: গান-বাজনা মানুষের আত্মিক শান্তি ও মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। একে অতিরিক্ত শোনা মানে নিজেকে অস্থির ও অসন্তুষ্ট রাখা, যা আত্মার পবিত্রতা ও শান্তির পরিপন্থী।

৬.১০: চক্ষু ও কানের হেফাজত করা

সংজ্ঞা: চোখ ও কান-এ দুটি ইন্দ্রিয় আল্লাহর দেওয়া অমূল্য নিয়ামত। চোখ দিয়ে মানুষ দেখে, কান দিয়ে শোনে। কিন্তু যদি এই চোখ হারাম কিছু দেখে, আর কান হারাম কিছু শোনে-তাহলে এই নিয়ামত গুনাহের পথে পরিণত হয়। চক্ষু ও কর্ণের সংযম মানে-নিজেকে এমন দৃশ্য ও শব্দ থেকে রক্ষা করা, যা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে আনে।

চোখ-কানের দরজায় কড়া নাড়ে ইমানের শত্রু: মানুষের চোখ ও কান সরাসরি অন্তরের সাথে সংযুক্ত। চোখ যা দেখে, কান যা শোনে-তা সরাসরি হৃদয়ের ওপর প্রভাব ফেলে। এই প্রভাব ভালোও হতে পারে, খারাপও হতে পারে। তাই ইসলাম আমাদের এই দুই অঙ্গের হেফাজতের তাগিদ দিয়েছে।

হারামের ঢেউয়ে অন্তরের নূর নিভে যায়: আজকের যুগে মোবাইল, ইন্টারনেট, টিভি ও সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে চোখ ও কানে প্রতিনিয়ত এমন সব জিনিস প্রবেশ করছে-যা আমাদের হৃদয়কে কলুষিত করে দিচ্ছে। অশ্লীলতা, গান, গীবত, বদনজর-সবই ইমানের জন্য বিষাক্ত। চোখ যদি হারাম দেখে, আর কান যদি পাপ শোনে-তাহলে অন্তর আল্লাহর নূর থেকে বঞ্চিত হয়, ইবাদতে মন বসে না, আত্মা অস্থির হয়ে যায়।

আল-কুরআনের ভাষায়

- **দৃষ্টি হেফাজতের নির্দেশ:**

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"মুমিনদের বলো-তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য বেশি পবিত্রতা রয়েছে।" সূরা নূর, আয়াত ৩০

- **কান, চোখ ও অন্তরের হিসাব:**

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا "নিশ্চয়ই শ্রবণ, দৃষ্টি ও অন্তর-এসব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" -সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৬

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

"العَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ تَزْنِيَانِ، وَزِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ"

"চোখের জিনা হলো (হারাম জিনিস) দেখা, কানের জিনা হলো (হারাম জিনিস) শোনা।"
-সহীহ মুসলিম

উদাহরণ

১. একজন যুবক, সারাদিন মোবাইলে সিরিজ দেখে, অশ্লীল দৃশ্য দেখে-তার নামাযে মন বসে না, কুরআন তিলাওয়াতে হৃদয় বিগলিত হয় না।

২. একটি মেয়ে, ইনস্টাগ্রামে গান ও গ্ল্যামার ফলো করে-তার পোশাকে পরিবর্তন আসে, হিজাবের প্রতি উদাসীনতা বাড়ে।

৩. এক শিশু, বাড়িতে প্রতিদিন গীবত শুনে-সে বড় হয়ে সেই অভ্যাসই গ্রহণ করে।

অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণত

চোখ ও কানের অবাধতা প্রথমে অন্তরকে কলুষিত করে, এরপর ইমানকে দুর্বল করে, তারপর গুনাহকে স্বাভাবিক করে তোলে। এক সময় এমন হয় যে, হারাম আর হারাম মনে হয় না। সালাত ফেলে দিতে কষ্ট হয় না, কুরআন খুলে পড়তে ইচ্ছে করে না। এই দুই অঙ্গই তখন শয়তানের রাস্তা বানিয়ে ফেলে।

হেফাজতের বরকত

যে ব্যক্তি চক্ষু ও কানের হেফাজত করে, সে অন্তরকে পবিত্র রাখে। পবিত্র অন্তরে আল্লাহর নূর নেমে আসে, কুরআনের তিলাওয়াতে কান তৃপ্ত হয়, এবং সালাতে চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। সুতরাং- ইমান বাঁচাতে চাইলে, আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে চাইলে, এই দুই অঙ্গকে হেফাজত করা ফরজের পর্যায়ে এসে যায়।

চোখ ও কানের হেফাজতের অভাবে জীবনের করুণ পরিণতি:

১. অন্তর অন্ধ হয়ে যায়: যে চোখ দিয়ে প্রতিদিন হারাম দৃশ্য দেখে-অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, সিনেমা-সেই চোখ আর আল্লাহর কুরআনের নূর দেখতে পায় না। এক সময় অন্তর এমন অন্ধ হয়ে যায়, যে তাওবার আলোও আর ঢুকতে চায় না।

২. কান হয়ে পড়ে গুনাহর মাধ্যম : এই কানে যদি গীবত, গান, বাজনা ঢোকে-তাহলে এক সময় হক কথা শুনতেও কান ব্যথা পায়। কুরআনের আয়াত শুনেও মন কাঁদে না, বরং বিরক্ত লাগে। এ কান কীভাবে জান্নাতি হবে?

৩. নামাজ শুধু শরীরের ব্যায়াম হয়ে যায়: যে চোখে সিরিজ-সিনেমা দেখা হয়, সেই চোখ যখন সিজদায় যায়, তখন সে চোখ কাঁদতে পারে না। যে কানে গানের সুর বাজে, সে কান যখন তাকবীর শোনে, তখন যেন হৃদয় কেঁপে উঠে না। ইবাদত প্রাণহীন হয়।

৪. গুনাহ সহজ, তাওবা কঠিন: প্রথমে হারাম দেখা ও শোনাকে “বেশি কিছু না”-এমন মনে হয়। কিন্তু আস্তে আস্তে সেই গুনাহ নেশায় পরিণত হয়। এক সময় নিজেই বলে ফেলে:
“তাওবা করবো... কিন্তু পরে।” এই ‘পরে’ আর আসে না।

৫. মৃত্যুর সময় চোখ-কান সাক্ষ্য দেবে: সেই চোখ, যেটি রাতভর গান শুনতে জাগে, আর ফজরের নামাজে ঘুমায়-কিয়ামতের দিন তা বলবে:
“হে আল্লাহ! আমি এ বান্দার হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি, সে আমার মাধ্যমে আপনাকে ভুলে গিয়েছিল।”

৬. জান্নাতের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়: যে চোখে গুনাহর নেশা, যে কানে পাপের সুর-সে কীভাবে জান্নাতে কুরআনের সুমিষ্ট সুর উপভোগ করবে? জান্নাতের সৌন্দর্য তো তাদের জন্য, যারা চোখ-কান হেফাজত করে।

অধ্যায় ৭: পারিবারিক ও সামাজিক করণীয়

দ্বীন ইসলাম একক কোনো ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যবস্থা নয়; এটি একটি সামষ্টিক দায়িত্ব, এক অপূর্ব জীবনব্যবস্থা, যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ-সকল পরিসরে একত্রে বাস্তবায়িত হলে তবেই পরিপূর্ণতা পায়। একজন মুমিন শুধু নিজের ইমান রক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; বরং তার দায়িত্ব হলো ঘরের দেয়ালে কুরআনের ছায়া ছড়িয়ে দেওয়া, সন্তানদের অন্তরে রাসূল (সা.)-এর প্রেম গেঁথে দেওয়া, আর সমাজের প্রতিটি প্রান্তে দ্বীনের আলো পৌঁছে দেওয়া।

যেখানে পরিবারে আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠা পায়, সন্তানদের আদর্শিক গড়নে রয়েছে নবি-আখলাকের শিক্ষা, সমাজে ন্যায়-নীতির ডাক দেওয়া হয় সাহসিকতার সাথে-সেই সমাজেই গড়ে ওঠে এক ইমানদার, আত্মমর্যাদাশীল, নৈতিক জাতি। এ অধ্যায়টি মূলত সেই অনুপম চিত্রকে তুলে ধরেছে-যেখানে ব্যক্তি নয়, বরং পরিবার ও সমাজ মিলেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিম্মাদার হয়ে উঠে।

৭.১ পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ গঠন

পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ গঠন বলতে বোঝায়-একটি ঘরে কুরআন-হাদীসের আলোয় জীবনের নিয়ম তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি সদস্য আল্লাহর ভয় ও রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা নিয়ে জীবনযাপন করে।

পরিবার- ইমানি সমাজের শিকড়: একটি জাতির মৌলিক ভিত্তি হলো পরিবার। আর পরিবারের মেরুদণ্ড হলো তার মূল্যবোধ। যদি পরিবারের ভেতরেই আল্লাহর ভয়, পরকালের চিন্তা, ও নবীজির সুন্নাহ অনুসরণ করা হয়-তবে সেখান থেকেই গড়ে ওঠে এক ইমানদার সমাজ। পরিবারে যদি সালাত কায়েম করা হয়, শিশুদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত হয়, মায়েরা হায়া ও পর্দার আদর্শ হন, বাবারা ঘরের কুদরতী অভিভাবক হন-তবে এই ঘরেই জান্নাতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।**শিশুর হৃদয়ে দ্বীনের বীজ বপন:** একজন শিশু যখন তার মায়ের মুখে রাসূলের কথা শুনে, বাবার কণ্ঠে কুরআনের আওয়াজ পায়, ভাই-বোনদের আচরণে দ্বীনের সৌন্দর্য দেখে-তখন দ্বীন তার হৃদয়ে গেঁথে যায় মজবুত শিকড়ের মতো। এমন পরিবেশে বেড়ে ওঠা সন্তান কেবল ভালো ছাত্র বা কর্মীই নয়, বরং একজন দায়িত্বশীল, নৈতিক, আল্লাহভীরু মানুষ হয়।

হাদীসে দায়িত্বের শিক্ষা: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল, এবং তোমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাব চাওয়া হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের অভিভাবক, এবং তার উপর তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে। -সহিহ বুখারী, হাদীস: ৮৯৩

ছোট উদ্যোগ, বড় প্রভাব:

- এক মা, যিনি প্রতিদিন ঘুমানোর আগে সন্তানকে ছোট করে একটি নবীজির কাহিনি শোনান।
- এক বাবা, যিনি ফজরের পর সন্তানকে নিয়ে দু'মিনিট করে যিকির করেন।
- একটি পরিবার, যেখানে রাতের খাবারের পর সবাই মিলে এক আয়াত কুরআন নিয়ে আলোচনা করে।

পরিবার হলো জান্নাতের পথে প্রথম ধাপ: এমন পরিবেশ সন্তানদের চরিত্রে আনে ভদ্রতা, আদর্শে আনে শুদ্ধতা, এবং জীবনে আনে ইমানি দৃঢ়তা। পরিবারই হয় জান্নাতের বাগান, আর সদস্যরা হয় জান্নাতের পথযাত্রী।

৭.২ সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা ও নজরদারি

সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা ও নজরদারি বলতে বোঝায়-তাদেরকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান, ইবাদতের গুরুত্ব ও নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেওয়া এবং প্রতিনিয়ত দেখভাল করা যেন তারা সঠিক পথে থাকে।

সন্তান আল্লাহর দেয়া নেয়ামত ও পরীক্ষা: সন্তান হলো আল্লাহর দেওয়া একটি পরীক্ষা ও অমূল্য নিয়ামত। এই নিয়ামতের হক আদায় করতে হলে পিতামাতাকে তাদের শুধু দুনিয়াবি নয়, বরং দ্বীনি শিক্ষায়ও গড়ে তুলতে হয়। কেননা, একজন সন্তান যদি দ্বীনি মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত হয়, তবে তার জীবনের পথ হবে অন্ধকার; আর সেই অন্ধকার একসময় পুরো পরিবারকেই গ্রাস করতে পারে।

দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্

:দ্বীনি শিক্ষা শিশুদের অন্তরে আল্লাহভীতি, পরকাল চেতনা ও নৈতিক বোধ সৃষ্টি করে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শেখানো, রাসূল (সা.)-এর জীবনচরিত পড়ানো, কুরআনের অর্থ জানানো, হালাল-হারামের বোধ করানো-এসবই তাদের ভিত মজবুত করে। কিন্তু শুধু শেখানো যথেষ্ট নয়; তাদের কাজকর্ম, বন্ধুবান্ধব, অনলাইন আচরণ সবকিছুর উপর সুদৃষ্টিও রাখতে হয়। এ দায়িত্ব শুধু শিক্ষক বা আলেমদের নয়-প্রথম দায়িত্ব বাবা-মায়ের।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর জাহান্নামের আগুন থেকে।"-(সূরা তাহরিম, আয়াত ৬)
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের অভিভাবক এবং তার উপর তার পরিবারের বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে।"
-সহিহ বুখারী, হাদীস: ৮৯৩

সন্তান: গর্ব ও জাতির ভবিষ্যৎ- একটি ছোট্ট গাছ যেমন নিয়মিত পানি, আলো আর যত্ন না পেলে শুকিয়ে যায়-একইভাবে একটি শিশু যদি ভালোবাসার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে তার আত্মিক বৃদ্ধি থেমে যায়। সে বেড়ে উঠলেও তার ভেতরে ফাঁকা পড়ে থাকে; এই ফাঁকা জায়গাতেই শয়তান আসন গাড়ে।

নজরদারি: সন্তান গঠনের মূল চাবিকাঠি- তাই শুধু সন্তান জন্ম দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। তাদের চিন্তা, সময়, আবেগ, বন্ধুত্ব-সব কিছুর দিকেই নজর দিতে হয়। নজরদারির অভাব মানেই সন্তানের ভবিষ্যৎকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া।

দ্বীনি প্রজন্ম: সমাজের রক্ষাকবচ- সন্তানকে শুধু শেখানো নয়, বরং তাকে দেখে রাখা, তার প্রতি খেয়াল রাখা, তার ভুলগুলো বুঝিয়ে দেওয়া-এই নজরদারি দিয়েই গড়ে ওঠে এক দ্বীনদার প্রজন্ম। আর এই প্রজন্মই হতে পারে জাতির রক্ষাকবচ। নজরদারি না করার কুফল শুধু একজন সন্তান নয়, বরং একটি গোটা পরিবার ও সমাজকে পতনের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

উদাহরণ

এক অভিভাবক, যিনি সন্তানের মোবাইল ব্যবহারের সময় নির্ধারণ করেন এবং কোন কনটেন্টে যাচ্ছে নজর রাখেন।

সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা ও নজরদারির তাৎপর্য:

সন্তান যদি হয় হৃদয়ের টুকরো, তবে তার আত্মা গঠনের দায়িত্বও পিতামাতার হৃদয় দিয়েই নিতে হয়। কেবল সুন্দর পোশাক, ভালো স্কুল বা ব্যস্ত সময়সূচী দিয়ে নয়-সন্তানকে মানুষ করতে হলে প্রয়োজন হৃদয়ের দোয়া, চোখের পানি, এবং হাতে কুরআনের আলো।
যে সন্তান কুরআনের সুরে ঘুমাতে শেখে, মায়ের মুখে রাসূলের গল্পে বড় হয়, বাবার কণ্ঠে তাকওয়ার কথা শোনে-সে সন্তান কোনোদিন জীবনভুলের পথে চলতে পারে না।

সন্তান যদি নামাজি হয়, পরহেযগার হয়, চরিত্রবান হয়-তবে সে হয়ে ওঠে শুধু বাবা-মায়ের গর্ব নয়, বরং জাতির ভবিষ্যৎও। আর এই সৎ সন্তানই কিয়ামতের দিন পিতা-মাতার জন্য হবে জান্নাতের সোপান। তাই দ্বীনি শিক্ষা ও নজরদারি কোনো আনুষ্ঠানিক বিষয় নয়, বরং এক নিঃশ্বাসে জেগে থাকা দায়িত্ব-যার ছোঁয়ায় পরিবার হয় জান্নাতের বাগান, আর সন্তান হয় জান্নাতের ফুল।

নজরদারি না করার কুফল

একজন অভিভাবক যদি সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার পর তাদের উপর যথাযথ নজরদারি না করে, তবে সে শিক্ষা অস্থায়ী হয়ে পড়ে। আর এই অবহেলা সন্তানদের এমন এক পথে ঠেলে দেয়, যেখানে তারা ধীরে ধীরে দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

- সন্তানরা হারিয়ে যেতে পারে ভুল সঙ্গের মধ্যে। তারা এমন বন্ধু বেছে নিতে পারে, যারা তাদের চরিত্র ও ঈমান ধ্বংস করে দিতে পারে।
- তারা পড়তে পারে সামাজিক ও অনলাইন ফিতনায়। আজকের যুগে মোবাইল, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া যদি নিয়ন্ত্রণহীন থাকে, তবে তা সন্তানের হৃদয়ে অশ্লীলতা, সন্দেহ ও গাফলতিতে ভরে দেয়।
- সন্তানরা দ্বীনের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। তারা নামাজ, পর্দা, সত্যবাদিতা, হালাল-হারামের গুরুত্ব ভুলে যায়।

- সন্তান হয়ে উঠতে পারে দুনিয়ামুখী ও আত্মকেন্দ্রিক। দয়া, দায়িত্ববোধ, আল্লাহভীতি ও পরকালচেতনার বদলে তারা শুধু এই দুনিয়ার স্বার্থ খোঁজে।

আর সবচেয়ে ভয়াবহ কুফল হলো-

সন্তান যদি ভুল পথে যায়, তবে কিয়ামতের দিন পিতা-মাতাকেও জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে। সন্তান বলবে, "আমার মা-বাবা আমাকে শেখায়নি, আমাকে দেখেনি, আমাকে বুঝায়নি।"

৭.৩ সমাজে নৈতিকতা ও দ্বীনি প্রচার

সমাজে নৈতিকতা ও দ্বীনি প্রচার বলতে বোঝায়-মানুষের মাঝে সত্য, সততা, পরহেজগারি, সহমর্মিতা ও আল্লাহভীতির মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়া। এটি এমন একটি প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে সমাজ আলোকিত হয়, সম্পর্ক পবিত্র হয় এবং মানুষ আল্লাহমুখী হয়।

নৈতিকতার সৌন্দর্য: একটি সমাজের সৌন্দর্য তার নৈতিকতায়। যদি সমাজের প্রতিটি স্তরে সততা, সহানুভূতি, ধৈর্য, হালাল-হারামের বোধ এবং দীনদারতা থাকে-তবে সে সমাজ হয়ে ওঠে জান্নাতের পূর্বাভাস। কিন্তু নৈতিকতা হারিয়ে গেলে মানুষ পশুর চেয়েও অধম হয়ে পড়ে।

সমাজের অবক্ষয় ও চিহ্ন: আজকের সমাজে যখন-

- মিথ্যা বলাকে স্মার্টনেস মনে করা হয়,
- পর্দা করা নারীকে পশ্চাৎপদ ভাবা হয়,
- ফিতনা, ফাহাশা আর অশ্লীলতা 'ট্রেন্ড' হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে-

তখন দ্বীনি প্রচারই হতে পারে বাঁচার একমাত্র আলো।

নৈতিকতা ও দ্বীনি প্রচারের তাৎপর্য: নৈতিকতা মানব জীবনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, যা চরিত্রে দৃঢ়তা, আন্তরিকতায় পবিত্রতা এবং কার্যকলাপে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে কেবল আখলাক বা আচরণে নয়, বরং সমাজে ন্যায়, সততা, সহমর্মিতা ও পরহেজগারিতার পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানায়। রাসূল (সা.)-এর জীবনের মূল শিক্ষা ছিল-মানুষকে আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম চরিত্রের দিকে আহ্বান করা।

দ্বীনি প্রচারের পদ্ধতি ও উদাহরণ

দ্বীনি প্রচার কেবল ভাষণ বা লেখালেখির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং নীরব আচরণ, ন্যায়নিষ্ঠ জীবনযাপন, ও মানবিক ব্যবহার-সবই দ্বীনের দাওয়াত। যেমনঃ

- একজন শিক্ষক যখন ন্যায়পরায়ণতা বজায় রেখে শিক্ষাদান করেন-সেটিও দ্বীনি প্রচার।
- একজন নারী যখন শালীনতা ও পর্দার মাধ্যমে সমাজে হায়ার সংস্কৃতি তুলে ধরেন-তাতেও হয় নৈতিকতার প্রসার।
- একজন তরুণ যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় বিনয়, সহনশীলতা ও হেদায়াতের বার্তা ছড়ান-সেটিও হয় ইসলামি দাওয়াত।

আল্লাহর নির্দেশে সম্মিলিত দায়িত্ব

কোরানে আল্লাহ পাক বলেন: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
অর্থ: "সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অপরকে সাহায্য করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সাহায্য করো না।" -সূরা আল-মায়েদাহ: ২

- **সমাজ গঠনের পবিত্র দায়িত্ব:** এই সমাজ আমাদের সন্তানদের খেলাঘর, আমাদের মা-বাবার শেষ আশ্রয়, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বীজতলা। যদি এই সমাজকে কলুষমুক্ত না রাখা যায়-তবে সেখানে অন্ধকারই জেঁকে বসে।
- **নীরব দাওয়াতের আলো:** দ্বীনি প্রচার যেন এক চুপচাপ বাতি জ্বালানো। চারদিক যখন অন্ধকারে ছেয়ে যায়, তখন কেউ একজন যদি ছোট্ট করে আলোর প্রদীপ জ্বালায়-সে আলোয় পথ খুঁজে পায় অনেকেই। সমাজে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার এই কাজ তেমনই একটি দায়, যা প্রতিটি বিশ্বাসীর হৃদয় থেকে উঠে আসা উচিত।
- **জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্বীনের বিস্তার:** দ্বীন শুধু মসজিদের ভেতর নয়-বরং রাস্তায়, বাজারে, অফিসে, ক্লাসরুমে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিটি জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে নৈতিকতার বার্তা। এই প্রচারের মাধ্যমেই তৈরি হবে এমন একটি সমাজ, যেখানে মানুষ মানুষের পাশে থাকবে-এবং আল্লাহর পথে চলবে সম্মিলিতভাবে।

৭.৪ মসজিদ, মাদ্রাসা ও ইসলামি সংগঠনের ভূমিকা

মসজিদ, মাদ্রাসা ও ইসলামি সংগঠন-এই তিনটি প্রতিষ্ঠান হল দ্বীনের তীর্থস্থান, আত্মিক উন্নয়নের কেন্দ্র এবং সমাজ গঠনের শিক্ষালয়। এসব প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ হলো-মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি জাগানো, সমাজে দ্বীনি চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া এবং নৈতিকতার আলোয় একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ করা।

যখন সমাজ ভেঙে পড়ে অশ্লীলতা, মাদক, অবজ্ঞা আর দুনিয়ালিপ্সায়, তখন এই তিনটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হয় অবিকল তিনটি বাতিঘর-যারা আলোর পথ দেখায় হতভাগা নৌকাগুলোকে।

১. মসজিদের ভূমিকা:
মসজিদ কেবল নামাজের স্থান নয়; বরং এটি ঈমান ও একতার কেন্দ্র। একটি জীবন্ত মসজিদ-

- মুসল্লিদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে,
- তরুণ প্রজন্মকে জুমআর খুতবায় নৈতিকতার শিক্ষা দেয়,
- এবং বয়স্কদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তোলে।

মসজিদের হুজুর যখন কোমল কণ্ঠে কুরআনের তিলাওয়াত করেন, তার প্রতিটি শব্দ যেন সমাজের অন্ধকারে আলো ঢেলে দেয়। নামাজের কাতারে দাঁড়ানো মানুষেরা তখন বুঝতে শেখে-সবচেয়ে বড় পরিচয়, "আমি একজন মুসলমান।"

২. মাদ্রাসার ভূমিকা:
মাদ্রাসা হলো সেই প্রতিষ্ঠান, যেখানে শুধু পড়ানো হয় না-গড়া হয় মানুষ। এখানে শিশুরা শেখে-

- কিভাবে একজন মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন কাটায়,
- কীভাবে মিথ্যা থেকে বাঁচে,
- কীভাবে হালাল জীবিকা অর্জন করে এবং
- কীভাবে মানুষকে ভালোবাসে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।

মাদ্রাসা শুধু হিফজ বা ফিকহ শেখায় না-এটি শেখায় জীবনযাপন, বিনয়, তাকওয়া ও সুনীতি।

৩. ইসলামি সংগঠনের ভূমিকা:
ইসলামি সংগঠনসমূহ সমাজের বুকে এক একটি দীপ্ত তারার মতো।তারা-

- দরিদ্রের ঘরে রমজানে ইফতার পৌঁছে দেয়,
- অসহায় ছেলেমেয়েদের দ্বীনি শিক্ষা দেয়,
- যুবকদেরকে গান-বাজনার আসর থেকে টেনে এনে কুরআন চর্চার মহফিলে নিয়ে আসে।

এই সংগঠনগুলো পত্রিকা, বই, ওয়েবসাইট, সেমিনার, দাওয়াহ কর্মসূচি-সবকিছুর মাধ্যমে সমাজে সচেতনতার বাতি জ্বালিয়ে রাখে। তারা একাধারে কর্মী গড়েও, সমাজ বদলায়।

দ্বীনের তিন আলো: মসজিদ, মাদ্রাসা ও ইসলামি সংগঠন-এরা যেন সমাজের হৃদয়ে লাগানো তিনটি ভরসার বৃক্ষ।

- যেখানে ক্লান্ত হৃদয় বিশ্রাম পায়,

- ভ্রান্ত পথিক দিকনির্দেশনা পায়,
- আর পথহারা মানুষ ফিরে পায় ঈমানের ছায়া।

একজন বাবা যখন সকালে সন্তানকে মাদ্রাসায় পাঠান, একজন তরুণ যখন ইসলামি বইয়ের সভায় যান, একজন বৃদ্ধ যখন মসজিদের মেঝেতে বসে কাঁদেন-তখনই সমাজে দীন বেঁচে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি উদ্যোগ যেন দ্বীনের চিরজাগ্রত এক আলো, যা কখনও নিভে যায় না।

ভবিষ্যতের জন্য ভিত্তি: একটি জাতিকে যদি নির্মল, নৈতিক ও আল্লাহভীরু করে গড়ে তুলতে হয়-তবে মসজিদ, মাদ্রাসা ও ইসলামি সংগঠনকে থাকতে হবে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে কার্যকর ভূমিকায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভালোবাসা, সাহায্য ও সংরক্ষণ করা শুধু দ্বীন নয়-বরং সমাজ ও জাতির ভবিষ্যতের জন্য এক অপরিহার্য দায়িত্ব।

৭.৫ দাওয়াহ ও নসীহতের কার্যক্রম

দাওয়াহ শব্দটি আরবি "دَعْوَة" থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো "আহ্বান করা" বা "নিমন্ত্রণ জানানো।" এর মূল উদ্দেশ্য হলো কাউকে কোনো সঠিক পথ বা নৈতিকতার দিকে আহ্বান করা, বিশেষত আল্লাহর পথের দিকে।
নসীহত শব্দটি "نَصِيحَة" থেকে এসেছে, যার মানে হলো "পরামর্শ দেওয়া" বা "উপদেশ দেওয়া।" নসীহত হলো এমন একটি সতর্কতা বা উপদেশ, যা মানুষের কল্যাণের জন্য দেওয়া হয়, যাতে তারা সৎ পথে চলতে পারে এবং বিপথগামী না হয়।

দাওয়াহ ও নসীহত- দ্বীনের জীবন্ত ভাষা: ইসলামে দাওয়াহ ও নসীহতের কার্যক্রম হলো একে অপরের পরিপূরক। দাওয়াহ অর্থাৎ আল্লাহর পথে আহ্বান, এটি শুধুমাত্র মুখে নয়, বরং আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম, আচরণ, এবং চরিত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা উচিত। আর নসীহত হলো সতর্কতা বা ভালো পরামর্শ, যা আমরা অন্যকে দেয়ার মাধ্যমে তাদের কল্যাণের জন্য কাজ করি।

অন্ধকার সময়ে আলো জ্বালানো: আজকের সমাজে আমরা যদি দেখি, অনেক সময় মিথ্যাকে সাহসিকতা বা স্মার্টনেস মনে করা হয়, অশ্লীলতা সাধারণ হয়ে যায়, এবং দ্বীনি মূল্যবোধ যেন হারিয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটে দাওয়াহ ও নসীহত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দ্বীনি প্রচার,

ইসলামি মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা, এবং দীনদার সমাজ গঠন করার জন্য এটি এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

আচরণই হোক আহ্বান: দাওয়াহ ও নসীহত শুধুমাত্র বক্তৃতা নয়, বরং প্রতিটি মুসলিমের জীবনযাত্রা, তার চরিত্র এবং আচার-আচরণ দ্বারা প্রকাশিত হওয়া উচিত। একটি ছোট্ট কাজও, যেমন একজন মা যখন সন্তানের সামনে ইসলামিক মূল্যবোধের কথা বলে, একজন ব্যবসায়ী যখন সততার সঙ্গে ব্যবসা চালায়, বা একজন শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা দেয়- এগুলোই দাওয়াহ ও নসীহতের অংশ।

কুরআনের নির্দেশনা:হিকমাহ ও সুন্দর উপদেশের আহ্বান

কোরানে আল্লাহ নির্দেশ দেন, وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "তুমি তোমার রবের পথে আহ্বান করো প্রজ্ঞা এবং সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সঙ্গে আলোচনায় শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি অবলম্বন করো।" -সূরা আন-নাহল: **১২৫**

হাদীসের দিকনির্দেশনা: দায়িত্বশীলতার চেতনা

১) ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -- (সহিহ বুখারী, হাদীস: ৮৯৩)

তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাব চাওয়া হবে। শাসক তার প্রজাদের অভিভাবক এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, একজন পুরুষ তার পরিবারের অভিভাবক এবং তার উপর তাদের দায়িত্ব রয়েছে, নারী তার স্বামীর ঘরে অভিভাবিকা এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, একজন খাদেম তার মনিবের সম্পদের দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তাকেও জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেকেরই নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

২) আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَن تَبِعَهُ، لَا يَنقُصُ ذَٰلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا- "যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে আহ্বান করে, তার জন্য ঐ সমস্ত লোকদের সমপরিমাণ সওয়াব থাকবে যারা তার অনুসরণ করে তাদের সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না।" সহিহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৭৪ (পুরাতন: ৩৩৫৩)

আমরা কি দায়িত্ব ভুলে গেছি: এই সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি দাওয়াহ ও নসীহতের দায়িত্ব আমাদের এক ধরনের পরীক্ষা। আজকের দিনে, যখন চারপাশে অন্ধকার, বিভ্রান্তি এবং হতাশা ছড়িয়ে পড়েছে, তখন আল্লাহর পথে আহ্বান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি সবার জন্য এক নতুন আশা ও প্রেরণা হতে পারে। আজকাল, প্রায়ই মনে হয়, যে যতটুকু নিজের জীবন পার করছে তাতেই সন্তুষ্ট; কিন্তু আল্লাহর পথে আহ্বান করা এবং সঠিক পথে চলার দাওয়াহ দেওয়া এক পবিত্র দায়িত্ব। বিশেষত, যখন আমরা দেখি যে আজকাল অনেকেই এই দাওয়াহ দেয় না বা দ্বীনি শিক্ষা থেকে দূরে চলে গেছে, তখন আমাদের দায়িত্ব বেড়ে যায়। আজকের সমাজে অনেকেই কেবল নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু আমরা যদি নিজেদের জীবনকে আল্লাহর পথে নিবেদিত করি এবং সেই পথে অন্যদের আহ্বান করি-তাহলে সমাজের মাঝে সত্যের আলো ছড়িয়ে যেতে পারে।

দাওয়াহর আলো- একটি প্রদীপ, অসংখ্য পথিক:দাওয়াহ ও নসীহত হলো সেই আলোর প্রদীপ, যা অন্ধকারে পথ দেখায়। যদি আমরা একটি ছোট্ট আলোর প্রদীপও জ্বালাতে পারি, তবে সেই আলোর মধ্যে অনেকেই তাদের পথ খুঁজে পাবে। সমাজে একে অপরকে ভালো পথের দিকে আহ্বান করা, সতর্ক করা-এটি কেবল একজন মুসলিমের দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেক মানুষের মানবিক দায়িত্ব। আজকের দিনে, এই কার্যক্রম আমাদের আরো প্রয়োজন। সমাজে ভালো কাজের প্রতি আকর্ষণ, নৈতিকতা, এবং ইসলামের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করা শুধুমাত্র আমাদের দাওয়াহ ও নসীহতের মাধ্যমে সম্ভব।

সততা ও শান্তির পথে আহ্বান: দাওয়াহ ও নসীহত শুধু মুসলিমদেরই কাজ নয়, এটি একটি চিরন্তন দায়িত্ব, যা সবার মধ্যে ইসলামের আলোকিত পথে আহ্বান করতে সাহায্য করে। এটি একটি নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা, যা সমাজকে সততা, নৈতিকতা ও শান্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের উচিত, প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি কথায়, আমাদের জীবনকে এমনভাবে সাজানো যাতে অন্যরা আমাদের মাধ্যমে আল্লাহর পথে ফিরে আসতে পারে এবং সত্যের পথ অনুসরণ করতে পারে।

অধ্যায় ৮: কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা

ইসলাম এমন একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যার মূল ভিত্তি কুরআন ও হাদীস। এই দুটি আলোকবর্তিকা মানবজীবনের প্রতিটি বাঁকে পথনির্দেশ দেয় এবং অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে তোলে। কুরআনের আয়াত আমাদের আমলের প্রতি আহ্বান জানায়, আর হাদীস আমাদের শেখায় কীভাবে রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে জীবন গঠন করতে হয়। সাহাবায়ে

কিরাম ও পূর্ববর্তী সালাফগণ এ আদর্শিক জীবন বাস্তবায়নের জীবন্ত উদাহরণ। এ অধ্যায়ে আমরা সেই নির্দেশনাগুলোকেই হৃদয়ছোঁয়া আলোকে অনুধাবনের চেষ্টা করব।

৮.১: কুরআনের আয়াতে আমল ও পরিশুদ্ধির নির্দেশ

আমল (সৎকাজ) ও পরিশুদ্ধি (তাযকিয়া) একজন মুমিনের জীবনের মূল ভিত্তি। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বহুবার মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার, পাপ থেকে ফিরে আসার এবং সৎ আমলের নির্দেশ দিয়েছেন। আমার জীবনে যদি আমলি অধঃপতন ঘটে-অর্থাৎ ইবাদতে অলসতা আসে, গুনাহ বাড়ে, দ্বীনি আগ্রহ কমে যায়-তাহলে কুরআনের নির্দেশনা আমাকে আবার জাগ্রত হতে সাহায্য করে। কুরআনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা:

১. আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সফলতা: (সূরা আল-আ‘লা, আয়াত ১৪)

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ অনুবাদ:“নিশ্চয়ই সে সফল, যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে।”

এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, প্রকৃত সফলতা অর্জিত হয় আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে। আত্মশুদ্ধি মানে হলো, নিজের অন্তরকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলা। এটি কেবল বাহ্যিক আচরণে নয়, বরং অন্তরের গভীরে আল্লাহভীতি, খাঁটি নিয়ত এবং সৎকর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

২. আত্মার পরিশুদ্ধি ও কলুষতা: (সূরা আশ-শামস, আয়াত ৯-১০)

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا (٩) وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠)

“নিশ্চয়ই সে সফল, যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে; আর সে ব্যর্থ, যে তা কলুষিত করেছে।”

এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের আত্মার শুদ্ধি ও কলুষতার পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করছেন। যারা তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, তারা সফল হয়; আর যারা আত্মাকে পাপ ও অপবিত্রতায় নিমজ্জিত করে, তারা ব্যর্থ হয়। এটি আমাদেরকে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৩. খাঁটি তওবার আহ্বান: (সূরা আত-তাহরীম, আয়াত ৮)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةٗ نَّصُوحًا

অনুবাদ: “হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা করো।”

এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের খাঁটি ও আন্তরিক তওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। খাঁটি তওবা মানে হলো, পূর্বের পাপের জন্য আন্তরিক অনুশোচনা করা, তা থেকে বিরত থাকা এবং ভবিষ্যতে সেই পাপে না ফেরার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা। এটি আত্মশুদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৪. বিনয়ী নামাজীদের সফলতা: (সূরা আল-মু’মিনূন, আয়াত ১-২)

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١) ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ٢)

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই মুমিনরা সফল, যারা তাদের নামাজে বিনয়ী।"

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের সফলতার গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। যারা নামাজে বিনয় ও খুশু বজায় রাখে, তারা প্রকৃত সফল। নামাজে খুশু মানে হলো, মনোযোগ, বিনয় ও আল্লাহর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ সহকারে নামাজ আদায় করা। এটি আত্মশুদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

৮.২: রাসূল (সা.)-এর জীবনী থেকে শিক্ষা (আমলি অধঃপতনে করণীয়)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ছিল পূর্ণাঙ্গ আমলের প্রতীক। তিনি আমাদের জন্য এমন এক আদর্শ-যাঁর জীবনী অনুসরণ করলে আমলি অধঃপতন থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

১. আমলের ধারাবাহিকতা: রাসূল (সা.) সব সময় ইবাদতে অটল ছিলেন এবং সাহাবাদেরও ধারাবাহিক আমলের শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন:أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৪৬৪)

আমল যদি থেমে যায়, তবে ছোট হলেও নিয়মিত কিছু ইবাদত শুরু করা উচিত, যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, তাসবিহ, কুরআন তিলাওয়াত। ধারাবাহিক আমল আত্মশুদ্ধির পথে প্রবৃদ্ধি আনে।

২. তওবা ও ইস্তিগফারের গুরুত্ব: রাসূল (সা.) নিজে শতবার ইস্তিগফার করতেন, যা আমলি দুর্বলতার সময় অপরিহার্য। তিনি বলেছেন: وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ অর্থ:"আমি প্রতিদিন আল্লাহর নিকট একশোবার ইস্তিগফার করি।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৬৮৭৯)

আমলি অধঃপতন হলে, তওবা ও ইস্তিগফার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া যায় এবং আল্লাহর নিকট নিজেকে পুনরায় শুদ্ধ করা সম্ভব হয়।

৩. রাতের নফল ইবাদতের গুরুত্ব: রাসূল (সা.) রাতের ইবাদতকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। আল্লাহ তাঁর উপর এই নির্দেশ প্রদান করেছিলেন:

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

"হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রির বেলা দাঁড়িয়ে (ইবাদত করো) কিছু সময়।"(সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত ১-২)

 আমলে ফেরার জন্য রাতের কিছু সময় আল্লাহর ইবাদতে কাটানো অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে। রাতের ইবাদত হৃদয়ে নরমতা আনে এবং আল্লাহর নিকট পৌঁছানোর একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

৪. সাহাবাদের প্রতি রাসূলের দয়া ও উৎসাহ: রাসূল (সা.) সাহাবাদের কখনো কঠিনভাবে বাধা দেননি, বরং ধীরে ধীরে সহজভাবে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করতেন। তিনি বলেছেন:

وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

"সুসংবাদ দাও, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করো না। সহজ করো, কঠিন করো না।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৯)*

নিজের প্রতি কঠোর না হয়ে, ধীরে ধীরে এবং সহজভাবে ভালো আমলে ফিরতে চেষ্টা করা উচিত। প্রতিটি পদক্ষেপে ধৈর্য ও সহানুভূতির সাথে এগিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

৫.ছোট ছোট আমলকে তুচ্ছ না করা: প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন,

"لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا" "কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে কোরো না।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬২৬)এই হাদীস আমাদের শেখায় যে, আমল ছোট হোক কিংবা বড়, প্রতিটি ভালো কাজের একটি ওজন রয়েছে আল্লাহর দরবারে। কখনো হয়তো একটি ছোট হাসি কারো মন ভালো করে দেয়, একটি দুআ কারো জন্য রহমতের দরজা খুলে দেয়, কিংবা কারো কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ তাকে মানসিক শান্তি দেয়। এগুলোই অন্তরের পরিশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের ভিত তৈরি করে। তাই প্রতিদিন ছোট ছোট আমলকে অবহেলা না করে, সেগুলোকেও আন্তরিকভাবে করার চেষ্টা করা উচিত।

৬.সুন্নতকে জীবনের অংশ বানানো: রাসূল (সা.)-এর জীবন ছিল সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত। তিনি ঘুমানো, খাওয়া, কথা বলা, হাঁটা- এই সব সাধারণ কাজেও আল্লাহর স্মরণ করতেন এবং সুন্নতের আদর্শ অনুসরণ করতেন।

 আমাদের উচিত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর দেখানো পথে চলা- চেহারায় হাসি রাখা, ডান দিক দিয়ে খাওয়া, সালামের প্রচলন, ঘুমানোর আগে অজু করে দুআ পাঠ, এসব ছোট ছোট সুন্নত জীবনকে বরকতময় করে তোলে। যখন একটি মানুষের জীবন সুন্নতের ছায়ায় পরিচালিত হয়, তখন তার প্রতিটি কাজ ইবাদতে রূপ নেয় এবং তা আত্মশুদ্ধির পথকে প্রশস্ত করে।

৭.সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব: রাসূলুল্লাহ (সা.) সময়ের মূল্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি সাহাবাদের প্রতিনিয়ত তাগিদ দিতেন যেন তারা সময় নষ্ট না করে, বরং তা উপকারী কাজে ব্যয় করে। আত্মশুদ্ধির জন্য প্রতিদিন কিছু সময় নির্ধারণ করে আমলের চর্চা করা উচিত।যেমন:

- ফজরের পর ১০ মিনিট কুরআন তিলাওয়াত
- দুপুরে ৫ মিনিট তাসবিহ
- রাতে ২ রাকাত তাহাজ্জুদ

এই নিয়মিত ছোট ছোট সময়ভিত্তিক আমলগুলো অন্তরকে জাগ্রত রাখে, আত্মাকে শুদ্ধ করে এবং জীবনে একটি ঈমানী পরিবেশ তৈরি করে।

৮.অন্তরের রোগ চেনা ও চিকিৎসা: আত্মশুদ্ধি তখনই সম্ভব, যখন একজন ব্যক্তি নিজের অন্তরের দুর্বলতা ও রোগগুলো চিনতে পারে। অহংকার, হিংসা, রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত), অলসতা- এগুলো অন্তরের এমন ব্যাধি যা মানুষকে আমল থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। রাসূল (সা.) এসব রোগের জন্য নির্দিষ্ট আমল ও দুআ আমাদের শিখিয়েছেন।

- অহংকার থেকে বাঁচতে বিনয়ী হওয়া
- রিয়া থেকে মুক্তি পেতে ইখলাসের জন্য দুআ করা
- অলসতা দূর করতে সকালের সময় কাজে লাগানো

যখন কেউ নিজের অন্তরের দুর্বলতাগুলো আল্লাহর কাছে তুলে ধরে এবং সেগুলোর চিকিৎসা চায়, তখন তার আত্মা সত্যিকার অর্থেই পরিশুদ্ধ হয়।

৯.মানুষের সেবা ও খিদমতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি: রাসূল (সা.) বলেছেন, "মানুষের মধ্যে উত্তম সে, যে অন্যের উপকারে আসে।" (সহীহুল জামে, হাদীস: ৩২৮৯)

মানুষের সেবা শুধু একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং তা আত্মশুদ্ধির এক শক্তিশালী মাধ্যম। গরিবদের সাহায্য করা, অসুস্থদের খোঁজ নেওয়া, অনাথ শিশুদের দায়িত্ব নেওয়া-এসব কাজ শুধু সমাজে শান্তি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করে না, বরং মানুষের হৃদয়কে নরম করে, অহংকার ভেঙে দেয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে এগিয়ে দেয়। সত্যিকারের আত্মশুদ্ধি চাইলে মানুষের খিদমতের পথকে জীবনচর্চায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১০.মোনাজাত ও কান্না: রাসূল (সা.) রাতের নির্জন সময়ে তাহাজ্জুদের নামাজে দাঁড়িয়ে কান্না করতেন। কুরআন তিলাওয়াতের সময় তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত। এই কান্না ছিল আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, ভয়, অনুশোচনা ও আশা প্রকাশের প্রতিফলন। যখন কেউ তার অন্তরের দুঃখ, পাপ, দুর্বলতা আল্লাহর দরবারে তুলে ধরে, মুনাজাতে নিজেকে ভেঙে দেয়- তখনই সত্যিকার আত্মশুদ্ধি শুরু হয়। এ ধরনের হৃদয় নিংড়ানো কান্না অন্তরকে নরম করে দেয়, গোনাহের বোঝা হালকা করে এবং আল্লাহর রহমতকে ডেকে আনে।

১১. তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর উপর ভরসা: রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করতেন। কঠিনতম বিপদের সময়েও তিনি হতাশ হতেন না, বরং আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষায় থাকতেন। আত্মশুদ্ধির পথে চলতে গেলে অনেক বাধা আসতে পারে- অলসতা, হতাশা, ব্যর্থতা বা নফসের টান। এসব মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন হয় তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরতা। যখন একজন মানুষ আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে নিজের চেষ্টা চালিয়ে যায়, তখন আল্লাহ তার পথ সহজ করে দেন এবং তাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যান।

আত্মশুদ্ধি কোনো হঠাৎ পাওয়া বিষয় নয়, বরং নিয়মিত ছোট ছোট আমলের মাধ্যমে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। এজন্য ধৈর্য, নিরবিচ্ছিন্ন চেষ্টা, ও আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা প্রয়োজন।

৮.৩: সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তী সালাফদের আমলীয় জীবন

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ছিলেন এমন এক নবীপ্রাপ্ত প্রজন্ম, যাঁরা আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রত্যক্ষ সাহচর্যে থেকে ইসলামের শিক্ষাকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। তারা শুধু ইলমেই নয়, আমলেও ছিলেন অগ্রগামী।তাঁদের পবিত্র জীবনাচরণ পরবর্তী তিন প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে- যাদেরকে বলা হয় সালাফে সালেহীন। তাঁরা আমলের মাধ্যমে ইসলামের আদর্শকে বাস্তব করে তুলেছেন।

১. আত্মশুদ্ধির প্রতি অগাধ আগ্রহ ও অন্তর বিশুদ্ধকরণ: সাহাবায়ে কিরামের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল-তারা নিজের অন্তরের রোগগুলো চিনতেন এবং সেগুলোর চিকিৎসায় সচেষ্ট থাকতেন। অহংকার, রিয়া, হিংসা-এসব অন্তরের ব্যাধি দূর করতে তারা রাতের ইবাদত, কান্না ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতেন।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলতেন -

"হিসাব নেয়ার আগেই নিজের হিসাব নাও, এবং আমলের ওজন হওয়ার আগেই নিজের আমল ওজন করে দেখো।" তিনি একবার এত বেশি কেঁদেছিলেন যে, চোখে দাগ পড়ে গিয়েছিল। কারণ, তিনি সবসময় ভাবতেন-তিনি হয়তো আল্লাহর কাছে যথেষ্ট খাঁটি হতে পারছেন না।

২. ছোট ছোট আমলের প্রতিও শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব: সাহাবিরা কখনোই ছোট কোনো আমলকে তুচ্ছ মনে করতেন না। তারা জানতেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হল-যেটি নিয়ত সহীহ এবং ধারাবাহিক।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রতিদিন রাতে আল্লাহর ইবাদতে সময় কাটাতেন এবং দিনের অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন। তিনি বলতেন- "একটি ভালো কাজ করো, হতে পারে তা জান্নাতে নিয়ে যাবে।" একবার তিনি এক অভুক্ত ব্যক্তি দেখে নিজের খাবার দিয়ে দিলেন এবং বললেন, "এ কাজের বদলে যদি আল্লাহ খুশি হন, সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট।"

৩. সুন্নতের নিখুঁত অনুসরণ: সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (সা.)-এর প্রতিটি কাজকে সুন্নত হিসেবে মানতেন এবং তা হুবহু অনুসরণ করতেন-সেটা ঘুমানোর ধরণ, খাওয়ার কায়দা, দোয়ার ভাষা হোক বা কথা বলার শৈলী।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) ছিলেন সুন্নতের অন্ধ অনুসারী। রাসূল (সা.) যেই রাস্তা দিয়ে হেঁটেছেন, তিনিও সেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন- যদিও সেই পথটি ঘুরে যেতে হয় তবুও তিনি সে পথই অনুসরণ করতেন।"। একবার রাসূল (সা.) একটি গাছের নিচে বসেছিলেন বলে তিনি প্রতিবার সেই গাছের নিচে নামাজ পড়তেন।

৪. দুনিয়াবিমুখতা ও আখিরাতমুখী চিন্তা: সাহাবারা দুনিয়ার বিলাসিতা নয়-আখিরাতের সফলতাকেই জীবনের মূল লক্ষ্য বানিয়েছিলেন। তারা নিজেদের ধন-সম্পদ, সময়, এবং জীবনের সেরা মুহূর্তগুলো আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিতেন।
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। কিন্তু একবার তাঁর কাছে যখন বিশাল লাভ এলো, তিনি তা গরীব ও ইয়াতিমদের মাঝে বিলিয়ে দিলেন। তিনি বলতেন, "এই সম্পদ আমাকে নয়, আমার ভাইদের প্রয়োজন বেশি।"

৫. মানুষের খিদমতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা: সাহাবিরা জানতেন-মানুষের খেদমত ইবাদতের একটি বড় শাখা। তারা অসুস্থের সেবা, অনাথের দেখভাল, গরিবকে সাহায্য, এমনকি পথপ্রদর্শনের মতো ছোট কাজকেও আল্লাহর সন্তুষ্টির একটি আমল হিসেবে গ্রহণ করতেন।
হযরত আলী (রাঃ) নিজ হাতে পানি টেনে গরীবদের ঘরে পানি পৌঁছে দিতেন। তিনি বলতেন- "আমি জানি না, কোন কাজ আল্লাহ বেশি পছন্দ করবেন, তাই সব কিছুই করার চেষ্টা করি।"

৬. সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও আমলে পরিকল্পনা: সাহাবিরা অলসতাকে ঘৃণা করতেন। তারা প্রতিটি মুহূর্তকে উপকারী কাজে লাগাতে চাইতেন। তারা সময় ভাগ করে নিতেন-ইবাদত, কুরআন, যিকির, দ্বীনি শিক্ষা ও খেদমতের জন্য।
হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলতেন-

"আমার জন্য একটি মুহূর্তও এমন চলে যাওয়া উচিত নয়, যার দ্বারা আমি আখিরাতে উপকৃত হবো না।”

৭. কঠিন সময়েও আমলের ধারা বজায় রাখা: সাহাবিরা যখন যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন, অথবা হিজরতের সময় সর্বস্ব হারিয়েছেন-তখনও তারা ইবাদত ছাড়তেন না। তারা জানতেন-আল্লাহর সন্তুষ্টি কষ্টের মধ্যেই বেশি লুকানো।

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ)-কে কুরাইশরা পাথরের আগুনে শুইয়ে নির্যাতন করেছিল, তবুও তিনি বলতেন-“আমরা ধৈর্য ধরবো, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মুক্তি দেন।” তিনি প্রতিদিন ফজরের পর সূর্য ওঠা পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত করতেন, যাতে অন্তর সবসময় আল্লাহমুখী থাকে।

অধ্যায় ৯: সফল উদ্যোগ ও বাস্তবিক প্রয়োগ

একজন মুমিনের জীবনে সফলতা তখনই আসে, যখন তার আত্মা শুদ্ধ, আমল টেকসই, সময়ের সঠিক ব্যবহার আছে এবং সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়। আত্মশুদ্ধি শুরু হয় নিজের ভুলগুলো স্বীকার করা থেকে, আর শেষ হয় আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যমে। এ পথটা কঠিন, কিন্তু যারা এই পথে হাঁটে, তাদের মুখে প্রশান্তির হাসি লেগেই থাকে। একজন আত্মশুদ্ধ মানুষ সমাজের জন্য রহমত হয়ে দাঁড়ায়- তার উপস্থিতিই হয় কল্যাণের ছায়া।

৯.১ আত্মশুদ্ধির বাস্তব পদ্ধতি

আত্মশুদ্ধি কোনো কল্পনার বিষয় নয়, এটি জীবনের প্রতিটি দিনের, প্রতিটি নিঃশ্বাসের সত্য। একজন মানুষ যত বেশি নিজেকে বুঝতে শেখে, তত বেশি সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। আত্মশুদ্ধি মানে নিজের ভিতরে আলো জ্বালানো। নিজের কুপ্রবৃত্তি, অহংকার, হিংসা, লোভ, গুনাহের নেশা থেকে নিজেকে ধুয়ে ফেলা। ঠিক যেমন ভোরের শিশিরে পৃথিবীটা ধুয়ে যায়, আত্মশুদ্ধিও হৃদয়কে তেমন নির্মল করে।

এই আত্মশুদ্ধির জন্য কিছু বাস্তব পথ রয়েছে, যেগুলো একজন মানুষকে সত্যিকারের ভালো বানিয়ে তোলে-

১. আত্মসমালোচনা ও নিজের হিসাব রাখা

দিনের শেষে একবার নিজের দিকে ফিরে তাকানো-এটা একজন মুমিনের অভ্যাস হওয়া উচিত। আজ আমি কি কাউকে কষ্ট দিয়েছি? নামাজগুলো ঠিকমতো পড়েছি? কোনো কষ্টভরা

চোখকে অবহেলা করেছি কি? এমন আত্মসমালোচনা আমাদের ভেতরের অহংকারকে ধীরে ধীরে গলিয়ে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেকেই চিন্তা করুক যে আগামী দিনের জন্য কী প্রেরণ করেছে। আর আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সবিশেষ খবর রাখেন।"-সূরা হাশর, আয়াত ১৮

আত্নসমালোচনার নরম প্রশ্নপত্র

- আমি কি আজ ঠিকমতো সালাত আদায় করেছি?
- আমি কি আজ কারো কষ্টের কারণ হয়েছি?
- আমি কি আজ কাউকে একটু হলেও উপকার করতে পেরেছি?
- আমার চোখ, কান আর মুখ কি আজ ভালো পথে ছিল?
- আমি কি আজ মন দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করেছি?
- আমার সময় কি আজ বৃথা গেছে, না কিছু শিখেছি বা উন্নতি করেছি?
- আমার মা-বাবা, ভাই-বোন কিংবা বন্ধুর সাথে আমার আচরণ কেমন ছিল?
- আমি কি কারো ভুল দেখে নিজেকে তার চেয়ে ভালো ভেবেছি?
- আমার কোনো কাজ কি শুধু লোক দেখানোর জন্য ছিল?
- আমি কি আজ আমার মৃত্যুর কথা একবারও মনে করেছি?

উপকারিতা

- এসব প্রশ্ন প্রতিদিন আত্মার আয়নায় আমাদের দাঁড় করায়।
- মনের অহংকার ও গাফিলতি গলিয়ে দেয়।
- ধীরে ধীরে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার পথটা সহজ হয়।

প্রতিদিনের হিসাব রাখা আমাদের ভুলের বোঝা হালকা করে দেয় এবং তাওবার পথ খুলে দেয়।

আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন, তাদের অন্তরে দেন আত্মপর্যালোচনার আলো। কারণ তারা জানে, আজকের প্রতিটি কাজের জন্যই রয়েছে আগামীকালের জবাবদিহি।

২. তাওবা ও ইস্তিগফার – আত্মশুদ্ধির কোমলতম দরজা

তাওবা হলো আত্মশুদ্ধির সবচেয়ে কোমল, সবচেয়ে মর্মস্পর্শী পথ। মানুষ গুনাহ করে, এটাই তার স্বভাব। কিন্তু আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন ফেরার এক অপার সুযোগ-তাওবা। যত বড়ই হোক গুনাহ, একমাত্র তাওবাই তা মুছে দিতে পারে।

যখন একজন বান্দা নির্জনে একাকী বসে কাঁদে-"**হে আল্লাহ! আমি ভুল করেছি, আমায় মাফ করে দাও"**-তখন আকাশের ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করে। এই কান্নাই আত্মার ময়লা ধুয়ে দেয়, মনকে করে হালকা, হৃদয়কে করে কোমল।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"হে আমার সেই বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর সীমা অতিক্রম করেছ! আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"- সূরা যুমার, আয়াত ৫৩

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

"আমি প্রতিদিন সত্তরবারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করি।"- সহীহ বুখারী: ৬৩০৭

ইস্তেগফার আমল ট্র্যাকার

ইস্তেগফার (আরবী	বাংলা অর্থ	দিন ১	দিন ২	দিন ৩	দিন ৪	দিন ৫
أَسْتَغْفِرُ اللهَ	আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।					
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ	হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করো ও তাওবা কবুল করো, নিশ্চয়ই তুমি সবচেয়ে বেশি তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু।					
اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورُ	হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, দয়া করো ও তাওবা কবুল করো, নিশ্চয়ই তুমি সবচেয়ে বেশি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।					
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ	হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো ও দয়া না করো, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো।					
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ	হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সমস্ত মুমিনকে ক্ষমা করো যেদিন হিসাব কায়েম হবে।					

সাইয়্যিদুল ইস্তেগফার -সর্বোত্তম ইস্তেগফার

اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার সাথে আমার চুক্তির উপর আছি যতটা পারি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্টতা থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আমি আপনার নেয়ামতের স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং আমার গুনাহরও স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন না।

৩. নিয়তের বিশুদ্ধতা: ইবাদতের প্রাণ

যখন কোনো কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তখন সেখানে অহংকার থাকে না, লোভ থাকে না, কারো কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। বরং সেই কাজটি মানুষকে বিনয়ী করে তোলে, সহজ করে তোলে। একটি ছোট সদকা, কারো জন্য করা একটি দোয়া, অথবা একটি আন্তরিক হাসি-সবই তখন আল্লাহর দরবারে বড় হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

"তাদেরকে তো শুধু এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে।" - সূরা বাইয়্যিনাহ, আয়াত ৫

শুদ্ধ নিয়ত আমাদের সাধারণ কাজগুলোকে ইবাদতে পরিণত করে এবং অন্তরে প্রশান্তি এনে দেয়। ইখলাসই হল সেই আলো, যা আমাদের দুনিয়ার কাজকে আখিরাতের সঞ্চয়ে পরিণত করে।

নিয়তের আয়না

প্রশ্ন	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
আজ কি শুধু আল্লাহকে খুশি করার জন্য নামাজ পড়েছি?							
পড়াশোনা বা কাজ কি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছি?							
কাউকে কিছু দান বা সাহায্য করেছি কি শুধুই আল্লাহর জন্য, রিয়ার ছোঁয়া ছাড়া?							
কারও ভালো দেখে কি অন্তর পরিষ্কার রাখতে পেরেছি?							
কোনো এক মুহূর্তে অহংকার ঢুকে পড়েছিল কি মনে?							

এই প্রশ্নগুলো খুব সাধারণ মনে হলেও, এর উত্তরের গভীরে লুকিয়ে থাকে আমাদের অন্তরের প্রকৃত অবস্থা। দিন শেষে এই আয়নায় একবার তাকানো মানেই-আত্মাকে আল্লাহর পথে ফেরানো। যে নিয়ত বিশুদ্ধ করে, তার অতি সামান্য আমলও মহান হয়ে যায় আল্লাহর কাছে।

৪. **তাহাজ্জুদ ও রোজার অভ্যাস: আত্মশুদ্ধির দুই অপূর্ব সোপান**

মানবজীবনে এমন কিছু মুহূর্ত থাকে, যেগুলো শব্দে নয়-নিঃশব্দতায় কথা বলে। তাহাজ্জুদের সময়টা তেমনই এক পবিত্র নিঃশব্দতা, যেখানে স্রষ্টার সামনে আত্মা নিজের সমস্ত ক্লান্তি, পাপ ও অভাব খুলে ধরে। রাতের শেষ প্রহরে যখন পৃথিবী ঘুমায়, তখন একটি অদৃশ্য দরজা খুলে যায়-আল্লাহর দয়ার দরজা। আর সেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কান্নার মাঝে বান্দা পায় মুক্তির স্বাদ।

তাহাজ্জুদের নামাজ একান্ত ইবাদত। এতে থাকে না লোক দেখানো কোনো উন্মাদনা, থাকে না বাহ্যিকতা। এখানে কেবল থাকে একটি হৃদয়, একটি অনুতপ্ত আত্মা, আর আল্লাহর অসীম দয়ার প্রত্যাশা। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য এ এক মহাসন্ধান। এই নামাজ অন্তরকে কোমল করে, গুনাহ থেকে দূরে রাখে এবং বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

"وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا"
"রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদের মাধ্যমে দাঁড়িয়ে ইবাদত করো, এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত ইবাদত। আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে 'মাকাম মাহমুদ' তথা প্রশংসিত মর্যাদায় উন্নীত করবেন।"– সূরা ইসরা, আয়াত ৭৯

তাহাজ্জুদের পাশাপাশি আরেকটি আত্মশুদ্ধির মহান পথ হলো **রোজা।** রোজা শুধুমাত্র খাবার ও পানাহার থেকে বিরত থাকা নয়। এটি নফসের লাগাম টেনে ধরার এক শক্তিশালী প্রশিক্ষণ। এটি আত্মসংযমের চর্চা। রোজা একটি প্রশিক্ষণ, যা জিহ্বাকে গীবত থেকে রক্ষা করে, চোখকে হারাম থেকে হেফাযত করে, হৃদয়কে করে দয়ালু ও পরিশুদ্ধ। এটি শুধু একটি মাসব্যাপী ইবাদত নয়, বরং নফসকে আল্লাহর পথে পরিচালনার দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-
"الصِّيَامُ جُنَّةٌ"
"রোজা একটি ঢালস্বরূপ।"
– সহীহ বুখারী: ১৮৯৪

এই ঢাল গুনাহর তীর থেকে রক্ষা করে। এটি একদিক থেকে আত্মার পরিশুদ্ধি, আরেকদিক থেকে শারীরিক সংযমের অনুশীলন। এমনকি একটি হালকা ক্ষুধাও যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সহ্য করা হয়, তখন সেটি আত্মার জিহাদের অংশ হয়ে দাঁড়ায়।
সার্বিকভাবে বলা যায়, তাহাজ্জুদের অশ্রু আর রোজার সংযম-এই দুই ইবাদত আত্মাকে এমন এক স্থিতিশীলতা দেয়, যা শুধু পরকালেই নয়, দুনিয়ার জীবনেও অনন্য শান্তি ও প্রশান্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এ দুটি ইবাদত মানুষকে আল্লাহর সাথে একান্ত সখ্য গড়তে শেখায়, জীবনকে করে আলোকিত ও লক্ষ্যভিত্তিক।

তাহাজ্জুদ ও রোজা: আমল ট্র্যাকার

তাহাজ্জুদের জন্য উঠেছি?							
কত রাকাত পড়েছি?							
দোয়া করেছি?							
কাঁদতে পেরেছি?							
রোজা রেখেছি?							
চোখ, মুখ ও অন্তরের সংযম রক্ষা করেছি?							

দৈনিক আত্মজিজ্ঞাসা

- আজ তাহাজ্জুদের সময় অন্তর সত্যিই আল্লাহর কাছে নরম হয়েছিল কি?
- রোযা রাখার সময় কোন কোন জায়গায় সংযম হারাতে বসেছিলাম?
- কারো প্রতি মনোভাবে কি অহংকার বা রাগ এসেছিল?
- কোন দোয়া আজ বেশি করে করেছি? কেন?
- আজকের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত কোনটা ছিল আল্লাহর সঙ্গে সংযোগের?

তাহাজ্জুদ ও রোযার সময় পড়ার জন্য বিশেষ দোয়া

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ، وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ

"হে আল্লাহ, আমার অন্তরকে মুনাফিকি থেকে, আমলকে রিয়া থেকে, জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে, চোখকে খিয়ানত থেকে পবিত্র করে দাও।"

৫. সৎ সঙ্গ ও নফসের জিহাদ: আত্মশুদ্ধির যুগল সোপান

মানব আত্মার শুদ্ধি অনেক সময় নির্ভর করে সে কার সাহচর্যে জীবন কাটাচ্ছে তার উপর। এমন এক সঙ্গী, যার সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর স্মরণে উদ্ভাসিত করে হৃদয়কে,

জীবনের সর্বত্র জাগিয়ে তোলে ইবাদতের অনুভব-সে-ই হয় আত্মার প্রকৃত পথপ্রদর্শক। সদুপদেশ, উত্তম চরিত্র ও পরহেজগার পরিবেশ আত্মাকে প্রভাবিত করে আলোর পথে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"ভালো সঙ্গী আতর বিক্রেতার মতো, যার কাছাকাছি গেলে তার সুঘ্রাণে তুমিও মুগ্ধ হবে। আর মন্দ সঙ্গী হলো লৌহকর্মীর মতো, যার ধোঁয়া বা আগুনে পোশাক জ্বলে যেতে পারে।"
(সহীহ বুখারী: ৫৫৩৪)

এই সৎ সঙ্গ যেমন বাহ্যিক আচরণে প্রভাব ফেলে, তেমনি অন্তরের গভীরে শুরু হয় আরেকটি যুদ্ধ-নিজের নফসের সঙ্গে। নফস-এই আত্মিক প্রবৃত্তি কখনো প্রবৃত্তির গর্জনে, কখনো লোভ, হিংসা কিংবা অহংকারের চুপচাপ ফিসফিসানিতে টেনে নিয়ে যায় বিপথে।
এই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিদিনের আত্মসংগ্রামই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিহাদ-নিরব, একান্ত ব্যক্তিগত, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ বলেন:
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۝
"আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং কুপ্রবৃত্তিকে দমন করেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।"
(সূরা আন-নাযিয়াত, আয়াত ৪০-৪১)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু তোমার মধ্যকার নফস, যা তোমার দুই পাঁজরের মাঝে অবস্থান করে।"
(বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান)

৯.২: আমল টিকিয়ে রাখার রুটিন ও পরিকল্পনা

আমল করা অনেক সময় সহজ হলেও, তা নিয়মিত রাখা বা টিকিয়ে রাখা অনেক বেশি কঠিন। অনেকেই শুরুতে উৎসাহ নিয়ে ইবাদত করে, কিন্তু কিছুদিন পর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কেউ হয়তো একটি রাত তাহাজ্জুদের নফল নামাজ পড়ল, কিন্তু এরপর আর উঠে না। তাই একজন আল্লাহপ্রেমী বান্দার জন্য দরকার এমন একটি জীবনপদ্ধতি, যা আমলকে শুধু শুরুর মধ্যে

সীমাবদ্ধ না রেখে চিরস্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করে। এজন্য চাই রুটিন, পরিকল্পনা এবং আন্তরিকতা।

১. ছোট ছোট আমল নিয়মিতভাবে করা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

"আল্লাহর কাছে সেই আমলই প্রিয়, যা ধারাবাহিকভাবে করা হয়, যদিও তা অল্প হয়।"
(সহীহ মুসলিম)

আমরা মাঝে মাঝে বড় ইবাদতের দিকে দৌড়াই, কিন্তু টিকিয়ে রাখতে পারি না। অথচ, প্রতিদিন ১০ মিনিট কুরআন তিলাওয়াত, প্রতিদিন সকালে "আসতাগফিরুল্লাহ" ১০০ বার বলা, কিংবা রাতে ঘুমানোর আগে ৩টি সূরা পড়া- এগুলো ছোট হলেও যদি প্রতিদিন করা যায়, তা একজনকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা বানিয়ে দেয়।

আল্লাহ বলেন: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ

"তোমরা তোমাদের জন্য যা কিছু ভালো অগ্রিম পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে তা পাবে।"
-(সূরা বাকারা, আয়াত ১১০)

২. সময় ও ইবাদতের রুটিন তৈরি করা: সময়ের সঠিক ব্যবহার না করলে, আমল হারিয়ে যায় দুনিয়ার ব্যস্ততায়। তাই আমলকে জীবনের অংশ বানাতে হলে দরকার দৈনিক রুটিন- ফজরের পর ১৫ মিনিট কুরআন, দুপুরে দোহার আগে কিছু যিকির, রাতে ঘুমানোর আগে দোয়া ইত্যাদি।

আল্লাহ সময়ের কসম খেয়ে বলেছেন: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ

"শপথ সময়ের! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিতে রয়েছে।"
-(সূরা আল-আসর: ১-২)

তবে যারা সময়কে কাজে লাগিয়ে ইবাদতের জন্য পরিকল্পনা করে, তারা সেই ক্ষতির বাইরে থাকে।

৩. সৎ সঙ্গ ও ইবাদতের বন্ধু বানানো: আল্লাহর পথে চলার জন্য একজন বন্ধু যদি পাশে থাকে, তাহলে আমল করা অনেক সহজ হয়।

যেমন: কেউ যদি প্রতিদিন সকালে কুরআন পড়তে উৎসাহ দেয়, তাহাজ্জুদের জন্য ডাক দেয়, কিংবা ইসলামী আলোচনা করে- তাহলে সেই সম্পর্ক হয়ে ওঠে জান্নাতের দিকে চলার পথ।

আল্লাহ বলেন: وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"তারা একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।" (সূরা আল-আসর: ৩)

এটাই হলো আমল টিকিয়ে রাখার সবচেয়ে মজবুত সাপোর্ট সিস্টেম- পরস্পরের সাহায্য।

৪. আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া: আমল নিজের শক্তিতে ধরে রাখা যায় না। শয়তান, নফস, দুনিয়ার ব্যস্ততা- এসব প্রতিদিন আমল থেকে আমাদের সরিয়ে দিতে চায়। তাই প্রয়োজন আল্লাহর সাহায্য চাওয়া।

প্রতিদিন সূরা ফাতিহায় আমরা দোয়া করি:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

"আমাদের সরল পথে পরিচালিত কর।" -(সূরা ফাতিহা: ৬)

এই দোয়ার মধ্যে আছে আমল টিকিয়ে রাখার আকুতি। কারণ এই 'সরল পথ' মানে এমন জীবন, যেখানে আমল, ইবাদত ও আত্মশুদ্ধি নিয়মিতভাবে চলে।

হাদীসে আছে: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

"হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখো।"(তিরমিজি)

এই দোয়া রাসূল (সা.) নিজেই বেশি বেশি করতেন, আমলের ওপর টিকে থাকার জন্য।

৫. আত্মমূল্যায়ন ও আত্মপর্যালোচনা: প্রতিদিন দিনের শেষে নিজের অন্তরে প্রশ্ন করা:

- আজকে আল্লাহর কতটা স্মরণ করেছি?
- নামাজ ঠিকমতো পড়েছি?
- কাউকে কষ্ট দিয়েছি কি?

উমর (রা.) বলতেন:

"নিজের হিসাব নিজেই নাও, যেন কেয়ামতের দিন হিসাব সহজ হয়।"

আত্মসমালোচনার এই অভ্যাস আমাদের আমল ঠিক রাখতে সাহায্য করে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিজের ভেতরের ভুল দেখে, সে-ই পরদিন আরো ভালো হতে পারে।

আমল একটি ফুলের মতো-যত্ন না করলে শুকিয়ে যায়। আর রুটিন, পরিকল্পনা ও দোয়ার মাধ্যমে সেই ফুলকে প্রতিদিন পানি দিলে, তা অমলিন সৌরভ ছড়ায়। যে আল্লাহর দিকে চলার পথে নিজের জন্য একটি ইবাদতের রুটিন তৈরি করে, সে ধীরে ধীরে তার প্রভুর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হয়ে ওঠে।

একটি সাদকা, একটি সুরা, একটি তাসবিহ- প্রতিদিনের এই ছোট ছোট আমলই গড়ে তোলে একজন আত্মিকভাবে পরিপূর্ণ মানুষ।

৯.৩ সময় ব্যবস্থাপনা ও নিয়তের পরিশুদ্ধি

সময়ের সঠিক ব্যবহার এবং সঠিক নিয়ত আল্লাহর পথে সফলতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি মুসলমানের জন্য সময় খুবই মূল্যবান। একে সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর নিকট নিকটে নিতে পারে।

১. সময়ের গুরুত্ব ও এর সঠিক ব্যবহার

সময় মানুষের জীবনের এমন এক নিয়ামত, যা একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। একজন মুসলমানের জন্য সময় শুধু পার্থিব উন্নতির উপকরণ নয়, বরং আখিরাতের সফলতার মাধ্যমও বটে। এ কারণে সময়ের গুরুত্ব এবং তার সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তা'আলা বলেন: هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ ۝ َ

তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাত ও দিনকে পরস্পর অনুসরণশীল করেছেন, সেই ব্যক্তির জন্য, যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় বা কৃতজ্ঞ হতে চায়।" (সূরা আল-ফুরকান: ৬২)

এই আয়াত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে রাত-দিনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য সুযোগ-আমরা চাইলে তা থেকে শিক্ষা নিতে পারি, আল্লাহর কাছে নিকটবর্তী হতে পারি এবং কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারি।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغ 'দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ঠকে যায়: একটি হলো সুস্থতা, অপরটি অবসর।" (সহিহ বুখারি, হাদীস: ৬৪১২)এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের জীবনে যে সময় পাওয়া যায়-বিশেষ করে অবসর সময়-তা অত্যন্ত মূল্যবান। এই সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে পরিণামে লোকসানের মুখোমুখি হতে হয়।

সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার ফলে যা অর্জিত হয়:

- আমলের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।
- পার্থিব দায়িত্ব ও দ্বীনী দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করা যায়।
- অন্তরের আত্মশুদ্ধি এবং চিন্তায় পরিষ্কার দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই হাদীস দিয়ে সময় ব্যবস্থাপনার মাহাত্ম্য বুঝতে পারি: الكَيِّسُ مَن دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوتِ، وَالعَاجِزُ مَن أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ

'বুদ্ধিমান সে, যে নিজেকে হিসাবের জন্য প্রস্তুত করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করে। আর অক্ষম সে, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর উপর

(কর্মহীন) আশা রাখে।" (তিরমিজি, হাদীস: ২৪৫৯) এই হাদীস আমাদেরকে সময়কে ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়, যেন তা আখিরাতে কাজে আসে।

অবশ্যই, হাদীসটি বাদ দিয়ে নিচে "নিয়ত পরিশুদ্ধি ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমল করা" বিষয়টি মার্জিত ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপন করা হলো:

২. নিয়ত পরিশুদ্ধি ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমল করা

আত্মা যখন হয় বিশুদ্ধ, নিয়ত তখন হয় আল্লাহমুখী। একটি ছোট কাজও তখন হয়ে যায় বিশাল সওয়াবের আধার, যদি তাতে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষা। ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়- আমলের বাহ্যিক রূপের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অন্তরের অন্তঃস্থ নিয়ত। কারণ নিয়তই নির্ধারণ করে, সেই কাজটি আল্লাহর কাছে কবুল হবে কি না।

নিয়ত যখন হয় নিঃস্বার্থ, তা মানুষকে করে আলোকিত ও স্থির। একটি খাবার দেওয়া, একটি হাসিমুখ, এমনকি চলতে গিয়ে কারো কষ্ট না দেওয়া- এই সব সাধারণ কাজও যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, তবে তা বান্দাকে তুলে নেয় উচ্চ মর্যাদার আসনে।

নিয়তের বিশুদ্ধতা একজন মুসলমানকে করে আত্মসম্মানিত ও আত্মনিয়ন্ত্রিত। এটি অন্তরের দিগন্তে স্থাপন করে এক স্বচ্ছ দিশা- যার আলোয় জীবন চলে সঠিক পথে, এবং আমল পায় স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য। নিয়ত হলো সেই নীরব ইবাদত, যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু আখিরাতে সবচেয়ে ওজনদার আমলেরূপে গণ্য হয়।

তাই, প্রতিটি কাজের আগে অন্তরকে প্রশ্ন করা উচিত- "এই কাজটি আমি কার জন্য করছি?" যদি উত্তর হয়- "আমার প্রভু আল্লাহর জন্য," তবে সেই কাজ হয়ে যায় নেকীর বাগান, যেখানে প্রতিটি ফুল ফোটে একেকটি সওয়াব হয়ে।

৩. সময় ব্যবস্থাপনার সাথে নিয়তের সম্পর্ক

সময়- এক অদৃশ্য নিয়ামত, যার প্রতিটি ক্ষণ বহন করে অফুরন্ত সম্ভাবনা। কিন্তু সেই সময় কেবল তখনই মূল্যবান হয়ে ওঠে, যখন তা সুপরিকল্পিত নিয়ত দিয়ে পরিচালিত হয়। বাহ্যিক কর্মের চেয়েও অন্তরের উদ্দেশ্যই সময়কে করে অর্থবহ।

একজন মু'মিনের জীবন এক সফর, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপই যদি হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে, তবে সময় আর শুধু সময় থাকে না- তা রূপ নেয় ইবাদতে, নেয়াকীতার সৌরভে ভরা এক সুবাসিত পথে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

الْبِرُّ لا يَبْلَى وَالْذَنْبُ لَا يُنْسَى

"সৎকর্ম কখনো মরে না, আর পাপ কখনো বিস্মৃত হয় না।" (তিরমিজি, হাদীস: ১৮০৯)

অর্থাৎ, প্রতিটি ভালো কাজ, যত ছোটই হোক, তা আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত থাকে এবং এর প্রতিদান একদিন অবশ্যই প্রদান করা হবে। তেমনি কোনো পাপকর্মও অজানায় হারিয়ে যায়

না- তা একদিন বিচারযোগ্য হবে। এই হাদীস আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সময়কে সৎকর্মে ব্যয় করাই প্রকৃত সফলতা, আর প্রতিটি কাজের নিয়ত ও ফলাফল চিরকালীন গুরুত্ব বহন করে।

অতএব, যদি নিয়ত হয় পরিশুদ্ধ, আর সময় ব্যবস্থাপনা হয় সুনিয়ন্ত্রিত- তবে একজন মুসলমানের জীবন হয়ে উঠতে পারে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে এক উজ্জ্বল সফর। সততা, ইখলাস ও আত্মনিয়োগ যদি মিশে যায় সময় ব্যবস্থাপনায়, তবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই হয়ে ওঠে সফলতার পাথেয়।

৪. সময় ব্যবস্থাপনায় সফলতা অর্জনের জন্য কিছু কার্যকর পদ্ধতি

- **গুরুত্বপূর্ণ কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া:** দিনের শুরুতেই ভাবা উচিত- আজ কোন কাজটি সবচেয়ে জরুরি? সেই কাজটিকেই তালিকার শীর্ষে স্থান দিয়ে আগে শেষ করা উচিত। কেননা, গুরুত্বপূর্ণ কাজকে পেছনে রেখে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে সময় ব্যয় করলে প্রকৃত অর্জন অধরাই থেকে যায়।

- **বিশ্রামের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয়:** প্রবল কর্মব্যস্ততায় কখনো কখনো আমাদের মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, চিন্তা হয়ে পড়ে ভারী। তাই কাজের ফাঁকে একটু বিরতি, কিছুটা বিশ্রাম- তা যেন নতুন করে এগিয়ে চলার শক্তি যোগায়। বিশ্রাম শুধু অলসতার নাম নয়, এটি পরিশ্রমের গতি বজায় রাখার এক অনন্য কৌশল।

- **মানসিক নমনীয়তা বজায় রাখা:** জীবন সবসময় পরিকল্পনামাফিক চলে না। হঠাৎ করে কোনো বাধা, কোনো পরিবর্তন এসে পড়তেই পারে। তাই আমাদের মনোভাবে থাকতে হবে নমনীয়তা, যেন প্রয়োজনমতো সিদ্ধান্ত বদল করতে পারি এবং সঠিক পথে চলতে পারি।

- **আল্লাহর সাহায্য কামনা ও দোয়ার মাধ্যমে সমর্থন চাওয়া:** সফল সময় ব্যবস্থাপনা শুধু মানসিক চেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয় না; বরং একজন ঈমানদার আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো কাজেই পরিপূর্ণতা প্রত্যাশা করে না। তাই প্রতিদিন সকালে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দোয়া করতেন:

اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلا

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কল্যাণকর জ্ঞান, পবিত্র রিজিক ও গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।”– সহিহ মুসলিম, হাদীস: ৪৮৩৩

এই দোয়া আমাদের শিখিয়ে দেয়- জ্ঞান, রিজিক এবং আমল- এই তিনটিই সময়ের সঠিক ব্যবহারে একে অন্যের পরিপূরক। যদি আমাদের কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, তবে তিনি আমাদের সময়কে বরকতময় করে দেন এবং আমাদের পথ সুগম করে দেন।

নিচে একজন শিক্ষার্থীর জন্য একটি সময়নিয়ন্ত্রিত, ভারসাম্যপূর্ণ ও আত্মশুদ্ধিমূলক দিনব্যাপী রুটিন চমৎকারভাবে সাজিয়ে দেওয়া হলো। এই রুটিনে ইবাদত, পড়াশোনা, বিশ্রাম, এবং নিজের শখের কাজ- সবকিছুর সুন্দর সমন্বয় রাখা হয়েছে:

একজন শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ দৈনন্দিন রুটিন

সময়	কাজ	তাৎপর্য
রাত ৩:৩০ – ৪:০০	তাহাজ্জুদের সালাত	নিম্ন স্বরে কান্নাজড়ানো হৃদয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।
৪:০০ – ৪:৩০	দোয়া ও মুনাজাত	নামাজ শেষে আত্মনিয়োগ, চোখের পানি ও চাহিদার কথা একমাত্র রবের কাছে বলা।
৪:৩০ – ৫:০০	ফজরের নামাজ ও পরবর্তী তাসবীহ	সালাত শেষে কিছু সময় যিকির, তাসবীহ,১০০ বার দুরুদ শরীফ পাঠ ও সূর্যোদয়ের অপেক্ষা।
৫:০০ – ৫:৩০	১০ পৃষ্ঠা সূরা বাকারা তিলাওয়াত	প্রতিদিন ১ টি সূরার অনুবাদ পাঠ ও ভাবনা।
৫:৩০ – ৬:৩০	সকালের যিকির ও মন প্রশান্তির সময়	• ৩৩বার سُبْحَانَ الله (আল্লাহ পবিত্র ও সকল খারাপ থেকে মুক্ত) • ৩৩ বার الْحَمْدُ لِلَّهِ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) • ৩৪ বার اللهُ أَكْبَر (আল্লাহ মহান)
৬:৩০ – ৭:৩০	সকালের নাশতা ও হালকা বিশ্রাম	পরিপূর্ণ পুষ্টিকর নাশতা ও পরিবারের সঙ্গে কিছু সময়।

৭:৩০ – ১২:৩০	একাডেমিক পড়াশোনা ও শ্রেনিকক্ষের জন্য প্রস্তুতি	একাগ্রতার সাথে পড়ালেখা ও লক্ষ্যপূরণে মনোযোগ। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে ৫০০ ইস্তিগফার পূর্ন করা
১২:৩০ – ১:৩০	দুপুরের খাবার, গোসল ও যোহরের নামাজ	সাফ-সুতরো হয়ে যোহরের নামাজ আদায় এবং কিছু হালকা বিশ্রাম।
১:৩০ – ২:৩০	কায়লুলা (দুপুরের ঘুম)	রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত অনুযায়ী বিশ্রাম, যাতে বিকেলে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
২:৩০ – ৪:৩০	পুনরায় একাডেমিক পড়াশোন	দুই ঘণ্টা পরিশ্রম মনোযোগ দিয়ে।
৪:৩০ – ৫:০০	আসর নামাজ ও হালকা রিফ্রেশমেন্ট	আসরের নামাজ শেষে অল্প হেঁটে মন সতেজ করা।
৫:০০ – ৬:০০	লেখালেখি / ছবি আকা / সিরাত পড়া / গবেষণা	আত্মউন্নয়নমূলক যেকোনো শখের কাজ, যেমন-ডায়েরি লেখা, আঁকা, গল্প পড়া।
৬:০০ – ৬:৩০	মাগরিবের সালাত ও সূরা ওয়াকিয়াহ পাঠ	দিনের শেষে রিজিকের বারাকাহের সূরা পাঠ।
৬:৩০ – ৭:৩০	রাতের খাবার ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো	সুন্দর পরিবেশে হালাল রিজিক গ্রহণ ও ঘরোয়া আনন্দ।
৭:৩০ – ৮:০০	এশার সালাত ও সূরা মূলক পাঠ	রাতের নিরাপত্তা ও কবরের আযাব থেকে বাঁচার প্রার্থনা।
৮:০০ – ৯:০০	হালকা পড়া বা শখের কাজ / পর্যালোচনা	দিনের আত্মমূল্যায়ন, ডায়েরি লেখা, কিছু হালকা পঠন বা নতুন কিছু শেখা।
রাত ৯:০০ টা	ঘুম	পরিপূর্ণ বিশ্রাম, যেন পরদিন আবার ফজরের আলোয় নতুন জীবন শুরু হয়।

১০. উপসংহার:

আমলি অধঃপতন কেবলই দুর্বলতা নয়, বরং আত্মশুদ্ধির এক প্রেরণা। এই অবনমনের মাঝে লুকিয়ে থাকে জেগে ওঠার সম্ভাবনা, ফিরে আসার আহ্বান। অন্তরের গাফিলতি, আমলের শৈথিল্য ও নিয়তের দুর্বলতা যদি সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়, তবে শুরু হয় আত্মপরিশুদ্ধির এক নতুন অধ্যায়। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে, তাকওয়া, ইখলাস ও তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তুললে আমলি পুনর্জাগরণ সম্ভব। ধারাবাহিক আত্মসমালোচনা, নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থাই হয়ে উঠতে পারে আমলকে টিকিয়ে রাখার একমাত্র পথ। আমলিক জীবনের অবক্ষয়ের এই পর্যায়টিই হতে পারে ঈমানি জাগরণের সূচনা।

রেফারেন্স

১. আল-কুরআন।

২. বুখারী, ইমাম। (২০১৭)। *সহীহুল বুখারী* (অনুবাদক: হাফেজ জাকারিয়া)। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

৩. মুসলিম, ইমাম। (২০১৮)। *সহীহ মুসলিম* (অনুবাদক: আবুল কালাম আজাদ)। ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন।

৪. রহমান, ড. আবুল কালাম। (২০১৬)। *ইবাদতের গোপন রহস্য*। ঢাকা: নুরুল হুদা পাবলিকেশন।

৫. হাসান, ড. শাইখ মুহাম্মাদ ইউনুস। (২০১৯)। *আত্মার পরিশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য*। ঢাকা: তাকওয়া পাবলিকেশন্স।

৬. মিজান, মাওলানা আব্দুল্লাহ। (২০২০)। *নফল ইবাদতের গুরুত্ব ও উপকারিতা*। খুলনা: ইসলামিক শিক্ষা পরিষদ।

৭. রফিক, শায়খ মাহফুজুল। (২০২১)। *ইখলাস ও নিয়তের শুদ্ধতা: কুরআন-সুন্নাহর আলোকে*। চট্টগ্রাম: সাদিক প্রকাশনী।

৮. আজহারী, মুফতি মিজানুর রহমান। (২০২২)। *প্রতিদিনের আমল: সময় ব্যবস্থাপনা ও আত্মগঠনের কৌশল*। ঢাকা: আল-কাউসার লাইব্রেরী।

৯. সালেহ, মাওলানা মুহাম্মাদ আরিফ। (২০২৩)। *ইবাদতে স্থিরতা: আমল টিকিয়ে রাখার বাস্তব পন্থা*। রাজশাহী: মারকাযে ইলমি।

১০. তাহের, মাওলানা মোহাম্মদ সাদ। (২০২৪)। *রূহানিয়াত ও যিকিরের প্রভাব*। সিলেট: তাহরীকুল ইসলাম।

১১. আহমেদ, ড. সালিম। (২০২১)। *আমলি অধঃপতন: কারণ ও প্রতিকার*। ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি।

১২. ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। (২০২০)। *আধুনিক সমাজে ইসলামের প্রতিক্রিয়া*। ঢাকা: ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

১৩. হোসেন, মাহফুজ। (২০১৭)। *ইসলামের দর্শন ও আধুনিক জীবন*। ঢাকা: বাংলাদেশের ইসলামিক গবেষণা পরিষদ।

১৪. ত্বহা, মুহাম্মাদ। (২০১৫)। *ইসলামের শুদ্ধতা ও আধুনিক সমাজ*। ঢাকা: আল-হিকমা পাবলিশার্স।

১৫. ফকরুদ্দীন, আব্দুল। (২০১৫)। *মুসলিম সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি*। লন্ডন: আল-মুহাম্মদ পাবলিকেশনস।